www.banglainternet.com represents

Dr. Zakir Naik's

QURAN O ADHUNIK BIGGAN
BIRODH NA SADRISSO
(THE QURAN AND MODERN SCIENCE CONFLICT OR CONCILIATION)

কুরআন ও আধুনিক বিজ্ঞান
বিরোধ না সাদৃশ্য

The Quran & Modern Science
Conflict or Conciliation

banglainternet.com

সূচিপত্র

প্রসঙ্গ কথা

পবিত্র কুরআন মাজীদ মানবজাতির পথপ্রদর্শক, পূর্ণাঙ্গ জ্ঞানের আধার ও সুপ্রতিষ্ঠিত সত্য। মহাজাগতিক যাবতীয় সৃষ্টি, প্রকৃতি ও পৃথিবীর সকল গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের মৌলিক ধারণা আল কুরআনে রয়েছে। তাই সঙ্গত কারণেই সর্বশেষ এ আসমানী কিতাবে স্থান পেয়েছে বেশ কিছু বিজ্ঞানময় আয়াত। আমরা জানি, বিজ্ঞান হচ্ছে বিশেষ জ্ঞান, যে জ্ঞান গবেষণা ও পরীক্ষা-নিরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়। তবে এ জ্ঞান কালপরিক্রমায় পরিবর্তিত হতে পারে।

তাই মানব মস্তিষ্ক থেকে উৎসারিত এসব জ্ঞান কুরআনের সাথে কতটা বিরোধ বা সাদৃশ্যপূর্ণ তা পর্যালোচনার বিষয়। এ ক্ষেত্রে প্রথমেই কুরআন ও বিজ্ঞানের বিষয়ভিত্তিক আলোচনার প্রয়োজন।

আল কুরআনের বিজ্ঞানময় আয়াত

পবিত্র কুরআনে রয়েছে সহস্রাধিক বিজ্ঞানময় আয়াত। এর মধ্যে সূরা মু'মিনুন এর ১২-২২ আয়াতে মহান রাব্বুল আলামিন ঘোষণা করেছেন–

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ مِنْ سُلٰلَةٍ مِّنْ طِيْنٍ ۔

আমি মানুষকে সৃষ্টি করেছি মৃত্তিকার উপাদান থেকে।

ثُمَّ جَعَلْنٰهُ نُطْفَةً فِىْ قَرَارٍ مَّكِيْنٍ ۔

অতঃপর আমি এটাকে স্থাপন করি এক নিরাপদ আধারে।

ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظٰمًا فَكَسَوْنَا الْعِظٰمَ لَحْمًا ثُمَّ اَنْشَاْنٰهُ خَلْقًا اٰخَرَ فَتَبٰرَكَ اللّٰهُ اَحْسَنُ الْخٰلِقِيْنَ ۔

পরে আমি এই শুক্রবিন্দুকে পরিণত করি আলাক-এ। অতঃপর এই 'আলাক'-কে পরিণত করি পিণ্ডতে। এবং এ পিণ্ডকে পরিণত করি অস্থিপঞ্জরে। অস্থিপঞ্জরকে ঢেকে দেই গোশত্ দ্বারা। অবশেষে এটাকে গড়ে তুলি অন্য এক সৃষ্টিরূপে। অতএব সর্বোত্তম স্রষ্টা আল্লাহ কত মহান। ثُمَّ اِنَّكُمْ بَعْدَ ذٰلِكَ لَمَيِّتُوْنَ ۔

এরপর তোমরা অবশ্যই মৃত্যুবরণ করবে। ثُمَّ اِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ تُبْعَثُوْنَ ۔

অতঃপর কিয়ামতের দিন তোমরা উত্থিত হবে।

وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَائِقَ وَمَا كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غٰفِلِيْنَ ۔

আমি তো তোমাদের উর্দ্ধে সৃষ্টি করেছি সপ্ত স্তর। এবং আমি আমার সৃষ্টি বিষয়ে কখনোই অসতর্ক নই।

وَاَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ فَاَسْكَنّٰهُ فِى الْاَرْضِ وَاِنَّا عَلٰى ذَهَابٍ بِهٖ لَقٰدِرُوْنَ ۔

এবং আমি আকাশ হতে বারি বর্ষণ করি। পরিমিতভাবে। অতঃপর আমি তা মৃত্তিকায় সংরক্ষণ করি এবং আমি এ বারি অপসারণ করতেও সক্ষম।

فَاَنْشَاْنَا لَكُمْ بِهٖ جَنّٰتٍ مِّنْ نَّخِيْلٍ وَّاَعْنَابٍ لَكُمْ فِيْهَا فَوَاكِهُ كَثِيْرَةٌ وَّمِنْهَا تَاْكُلُوْنَ ۔

অতঃপর আমি এর দ্বারা তোমাদের জন্য খেজুর এবং আঙুরের বাগান সৃষ্টি করি। এতে তোমাদের জন্য আছে প্রচুর ফল, আর তা হতে তোমরা আহার করে থাক।

وَشَجَرَةً تَخْرُجُ مِنْ طُوْرِ سَيْنَاءَ تَنْۢبُتُ بِالدُّهْنِ وَصِبْغٍ لِّلْاٰكِلِيْنَ ۔

এবং সৃষ্টি করি এক বৃক্ষ যা সিনাই পর্বতে জন্মে, এতে উৎপন্ন হয় তেল ও ব্যঞ্জন যা দ্বারা বিভিন্ন মানুষ আহার করে।

وَاِنَّ لَكُمْ فِى الْاَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيْكُمْ مِّمَّا فِىْ بُطُوْنِهَا وَلَكُمْ فِيْهَا مَنَافِعُ كَثِيْرَةٌ وَّمِنْهَا تَاْكُلُوْنَ ۔

এবং তোমাদের জন্য শিক্ষণীয় বিষয় আছে আনআম-এ। তোমাদের আমি পান করাই দুগ্ধ যা আছে এদের উদরে এবং এতে তোমাদের জন্য রয়েছে প্রচুর উপকারিতা। তোমরা এদের গোশত আহার কর।

وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُوْنَ ۔

তোমরা এতে এবং নৌযানে আরোহন কর।

সর্বশেষ ও চূড়ান্ত আসমানী কিতাব

আল-কুরআন। আল্লাহ এ কিতাব নাযিল করেন সর্বশেষ নবী হযরত মুহাম্মদ (স)-এর ওপর। যদি দাবী করা হয় কোনো একটা বই সেটা আল্লাহ তাআলার আসমানী কিতাব, যাদি দাবী করা হয় যে সেই বইয়ের কথাগুলো সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের, তাহলে বইটাকে সময়ের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হবে। বিভিন্ন সময়ে, বিভিন্ন যুগে বারবার প্রমাণিত হয়েছে- এটা সৃষ্টিকর্তার বাণী।

আগেকার দিনে সময়টাকে বলা হতো অলৌকিক কাজের বা মুজিযার যুগ। অলৌকিক কাজ হলো কোনো অস্বাভাবিক ঘটনা। যে ঘটনার কোনো ব্যাখ্যা দেয়া আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়। মুজিযা হলো কোনো অস্বাভাবিক ঘটনা, যার পেছনে রয়েছে অতি প্রাকৃতিক কোনো শক্তি; সর্বশক্তিমান ঈশ্বর। পবিত্র কুরআন হলো সবচেয়ে অলৌকিক।

কিন্তু কোনো আধুনিক মানুষ যদি অলৌকিক কিছু বিশ্বাস করতে চান, তবে তার আগে তিনি সেটা ভালোভাবে পরীক্ষা করে নেন। আলহামদুলিল্লাহ, পবিত্র কুরআন বারবার প্রমাণ করেছে এটা আল্লাহর বাণী যা নাযিল হয়েছিল ১৪০০ বছরের আগে। এমনকি বর্তমানেও আপনারা এটা পরীক্ষা করে দেখতে পারেন, আর ভবিষ্যতেও। সত্য সবসময় প্রমাণিত হবে যে এটা আল্লাহ তাআলার বাণী। কুরআন সবসময়ের জন্য অলৌকিক।

ধরুন, কোনো লোক যদি দাবী করে যে সে অলৌকিক কাজ করতে পারে তাহলে কি তা আপনারা এমনিতেই মেনে নিবেন?

যেমনটা দাবী করেছিল এক সাধুপাইলট। সে দাবী করেছিল যে, পানির নিচে একটা ট্যাংকের ভিতর সে তিন দিন ছিল। আর যখন খবরের কাগজের রিপোর্টাররা সেই ট্যাংকটা পরীক্ষা কারতে চাইল তখন সে বলল, মায়ের জরায়ুতে কি আপনারা কখনো পরীক্ষা করেন? এখানে তো সন্তানের জন্ম হয়। আর তখন সে রিপোর্টারদেরকে টাংকটি পরীক্ষা করতে দেয়নি। কোনো আধুনিক মানুষ কি এমন অলৌকিক কাজ মেনে নেবে? যদি এমন অলৌকিক বিষয় নিয়ে পরীক্ষা করা হয় তাহলে পৃথিবীখ্যাত জাদুকর পি সি সরকারকে বলা হতো এই পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ জীবিত ঈশ্বর-মানব!

পরবর্তীতে এলো সাহিত্য আর কবিতার যুগ। মুসলিম এবং অমুসলিম উভয়েই কুরআন শরীফকে এ যাবত পর্যন্ত প্রকাশিত সকল সাহিত্যের চেয়ে শ্রেষ্ঠতম এবং অনন্য সাহিত্য হিসেবে স্বীকার করেছেন।

সূরা 'বাকারা' এর ২৩-২৪ নম্বর আয়াতে উল্লেখ আছে।

وَاِنْ كُنْتُمْ فِىْ رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلٰى عَبْدِنَا فَاْتُوْا بِسُوْرَةٍ مِّنْ مِّثْلِهٖ وَادْعُوْا شُهَدَاۤءَكُمْ مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ـ

'আমি আমার বান্দার প্রতি যা অবতীর্ণ করেছি সে সম্পর্কে যদি তোমাদের কোনো সন্দেহ থেকে থাকে তোমরা এর অনুরূপ একটা সূরা আনয়ন কর। এবং তোমরা যদি সত্যবাদী হও তবে আল্লাহ ব্যতীত তোমাদের সকল সাহায্যকারীদের অহবান কর।'

فَاِنْ لَّمْ تَفْعَلُوْا وَلَنْ تَفْعَلُوْا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِىْ وَقُوْدُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ اُعِدَّتْ لِلْكٰفِرِيْنَ ـ

'যদি আনয়ন না কর! এবং কখনওই করতে পারবে না। তবে সেই আগুনকে ভয় কর কাফিরদের জন্য যা প্রস্তুত রাখা হয়েছে। মানুষ ও পাথর হবে যার ইন্ধন।'

যদি কোনো লোক এই চ্যালেঞ্জটা গ্রহণ করে তবে শর্ত হচ্ছে যে সূরাটা লেখা হতে হবে আরবিতে । পবিত্র কুরআনের ভাষার মতো পবিত্র কুরআনের ভাষা হচ্ছে অলৌকিক। অনতিক্রম ব্যাখ্যার মতো। কুরআনে রয়েছে সর্বোচ্চ অলংকার, আর কুরআনের একটা ছন্দ আছে। যখন আমরা কেউ অন্য কারো প্রশংসা করতে চাই

তখন আমরা সত্য থেকে দূরে সরে যাই। আর একথার সুন্দর একটা উদাহরণ হলো আমরা যখন হিন্দি সিরিয়ালগুলো দেখে থাকি, যখন নায়ক তার নায়িকাকে খুশী করতে গিয়ে বলে— 'ম্যে তোমহারে লিয়ে আসমান কি চাঁদ-সেতারে লে আঁও'–'আমি তোমাকে আকাশের চাঁদ-তারা এনে দেবো ইত্যাদি। আপনি যতই মানুষের প্রশংসা করতে যাবেন ততই সত্য থেকে দূরে সরে যাবেন। আলহামদুলিল্লাহ। যদিও কুরআনের কথার একটা ছন্দ আছে, কুরআন কখনো সত্য থেকে দূরে সরে যায়নি।

পৃথিবীর অনেক লোকই কুরআনের সূরার মতো সূরা লিখতে চেয়েছিল কিন্তু তারা চরমভাবে ব্যর্থ হয়েছে। এখন পর্যন্ত এটা করতে পারেনি এবং ভবিষ্যতেও অনুরূপ সূরা রচনা করতে পারবে না ইনশাআল্লাহ। কিন্তু ধরুন আমি আপনাকে এমন কোনো ধর্মগ্রন্থের কথা বললাম, যেখানে কাব্যিক ভাষায় বলা হয়েছে–'পৃথিবী সমতল'। আপনারা আধুনিক মানুষেরা কি সেটা বিশ্বাস করবেন? কারণ, এখনকার যুগ সাহিত্য আর কাব্যের যুগ নয়। বর্তমান পৃথিবীতে চলছে বিজ্ঞান এবং প্রযুক্তির যুগ। তাই আজকে আমরা দেখব পবিত্র কুরআন ও আধুনিক বিজ্ঞান কি পরস্পর বিরোধী না সাদৃশ্যপূর্ণ?

মহাগ্রন্থ আল-কুরআন বিজ্ঞানের কোন বই নয় বরং এটি হচ্ছে নিদর্শনের বই। 'আয়াত' অর্থ হচ্ছে– 'নিদর্শন'। কুরআনে ছয় হাজারেরও বেশি নিদর্শন বা আয়াত রয়েছে– যার থেকে এক হাজারেরও বেশি আয়াত বিজ্ঞানের বিষয়বস্তু নিয়ে আলোকপাত করেছে। কিছু কিছু মানুষ আছে যারা কুরআনের মাত্র একটা আয়াত শুনে বিশ্বাস করে। আবার কেউ কেউ দশটা, কারও হয়তো বিশটা লাগবে। আবার কাউকে হাজারটা নিদর্শন দেখাবেন তারপরও বিশ্বাস করবে না। আল কুরআন আসমানী কিতাব হিসেবে নিজস্ব কার্যকারণ ও যুক্তির ওপর গ্রহণযোগ্য ও প্রতিষ্ঠিত।

প্রখ্যাত পদার্থ বিজ্ঞানী ও নোবেল পুরস্কার বিজয়ী আলবার্ট আইনস্টাইনের মতে, 'ধর্ম ছাড়া বিজ্ঞান পঙ্গু, বিজ্ঞান ছাড়া ধর্ম অন্ধ।' আমি শুধু প্রতিষ্ঠিত বৈজ্ঞানিক সত্য নিয়ে আলোচনা করেছি; যা কল্পনা বা ধারণার ওপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠা কোন তত্ত্বকথা নয় এবং এমন কোন বিষয়ও নয় যা প্রমাণিত হয়নি। তাই যা প্রমাণিত নয় আমি তার অবতারণা করব না। কারণ বিজ্ঞান অনেক ক্ষেত্রেই সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করে। সুতরাং আমাদেরকে কুরআন অধ্যয়ন করতে হবে এবং বিশ্লেষণ করতে হবে– বুঝতে হবে কুরআন এবং আধুনিক বিজ্ঞান বিরোধপূর্ণ না সাদৃশ্যপূর্ণ?

জ্যোতির্বিজ্ঞান

(Astronomy)

মহাবিশ্ব সৃষ্টি সম্পর্কে জ্যোতির্বিদদের প্রদত্ত ব্যাখ্যা ব্যাপক গ্রহণযোগ্য একটি বিষয়। তত্ত্বটি 'বিগ ব্যাঙ' থিওরী হিসেবে পরিচিতি লাভ করেছে। যুগ যুগ ধরে নভোচারী এবং জ্যোর্তিবিদদের সংগৃহীত পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষামূলক তথ্যের মাধ্যমে এ বিষয়টি সমর্থিত হয়েছে। 'বিগ ব্যাঙ' (মহাবিস্ফোরণ) থিওরী অনুসারে মহাবিশ্ব প্রাথমিক অবস্থায় একটি বিশাল নীহারিকা আকারে ছিল। এরপর সেখানে একটা মহাবিস্ফোরণ সংঘটিত হয়। এটা দ্বিতীয় পর্যায়ের বিচ্ছিন্নতা। এর ফলে তৈরি হয় ছায়াপথ। কালক্রমে এগুলো তারকা, চন্দ্র ও সূর্য, গ্রহ ও উপগ্রহে রূপান্তরিত হয়। মহাবিশ্বের উৎপত্তি ছিল এক অনন্য ঘটনা যা দৈবক্রমে ঘটেনি।

পবিত্র কুরআন মহাবিশ্বের উৎপত্তি সম্পর্কে সূরা আম্বিয়া-এর ৩০ নম্বর আয়াতে বলা হয়েছে–

أَوَلَمْ يَرَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا .

অর্থ ঃ 'কাফিররা কি ভেবে দেখে না যে, আসমানসমূহ ও পৃথিবীর মুখ ছিল বন্ধ। (সৃষ্টির একটি অংশ হিসেবে) অতঃপর আমি উভয়কে খুলে দিলাম।'

আল-কুরআনের এ আয়াত এবং 'বিগ ব্যাঙ' তত্ত্বের মধ্যে বিস্ময়কর মিল কিছুতেই উপেক্ষণীয় নয়। আরবের মরুভূমিতে অবতীর্ণ হওয়া একটি গ্রন্থ কীভাবে এমন গভীর বৈজ্ঞানিক সত্যকে ধারণ করতে পারে তাও ১৪০০ বছর পূর্বে?

ছায়াপথ সৃষ্টির পূর্বে ছিল ধুম্রপুঞ্জ

বিজ্ঞানীদের অভিমত হচ্ছে মহাবিশ্বে ছায়াপথ গঠিত হওয়ার পূর্বে আকাশ সংশ্লিষ্ট পদার্থগুলো প্রাথমিকভাবে গ্যাস জাতীয় পদার্থের আকারে ছিল। সহজ ভাষায় বলা যায়, ছায়াপথ তৈরির পূর্বে বিপুল পরিমাণ গ্যাসীয় পদার্থ কিংবা মেঘ বিদ্যমান ছিল। আকাশ সম্পর্কিত প্রাথমিক পদার্থকে বর্ণনা করতে 'ধোঁয়া' শব্দটি গ্যাসের চেয়ে তুলনামূলক যথার্থ। কুরআনের সূরা হামিম সাজদা এর ১১তম আয়াতে ব্যবহৃত 'দুখান' শব্দটি দ্বারা বিশেষ এ অবস্থাটিকে বোঝায় যার অর্থ হচ্ছে– ধোঁয়া। এ আয়াতটিতে বলা হয়েছে—

ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ وَهِيَ دُخَانٌ فَقَالَ لَهَا وَلِلْأَرْضِ ائْتِيَا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا .
قَالَتَا أَتَيْنَا طَائِعِينَ .

অর্থ : অতঃপর তিনি আকাশের দিকে মনোযোগ দিলেন যা ছিল ধুম্রপুঞ্জ, এরপর তিনি তাকে (আকাশকে) এবং পৃথিবীকে বললেন, তোমরা উভয়ে এসো– ইচ্ছায় অথবা অনিচ্ছায়। তারা বললো স্বেচ্ছায় আসলাম।

তাছাড়া এটা স্বতঃসিদ্ধ যে, 'বিগ ব্যাঙ'-এর স্বাভাবিক ফল হলো এ ঘটনা এবং নবী হযরত মোহাম্মদ (স) -এর পূর্বে আরবের কারো কাছে এটি পরিচিত ছিল না। তাহলে, এ জ্ঞানের উৎস কী? এ জ্ঞানের উৎস আল কুরআন।

পৃথিবীর আকার গোল

সুদূর অতীতে মানুষের মধ্যে একটা বিশ্বাস প্রচলিত ছিল যে, পৃথিবীর আকার হচ্ছে চ্যাপ্টা বা স্ফীত। তাই পৃথিবীর কিনারা থেকে ছিটকে পড়ে যাবে এই ভয়ে শত শত বছর ধরে মানুষ বেশি দূর পর্যন্ত ভ্রমণ করত না। ১৫৯৭ সালে স্যার ফ্রান্সিস ডেইক প্রথম পৃথিবীর চারপাশে নৌভ্রমণের পর প্রমাণ করেন যে পৃথিবীর আকার গোলাকার।

দিবারাত্রির আবর্তন সম্পর্কে পবিত্র কুরআনের সূরা লুকমান-এর ২৯ তম আয়াতে উল্লেখ আছে–

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ .

অর্থ ঃ তুমি কি দেখো না যে, আল্লাহ রাতকে দিনের মধ্যে এবং দিনকে রাতের মধ্যে প্রবেশ করান?

উপরোক্ত আয়াতে বলা হচ্ছে, রাত ধীরে ধীরে এবং ক্রমশ দিনে রূপান্তরিত হয়, অনুরূপভাবে দিনও ধীরে ধীরে রাতে রূপান্তরিত হয়। পৃথিবী গোলাকার বলেই এ ঘটনা সম্ভবপর হয়েছে। যদি পৃথিবী চ্যাপ্টা হতো, তাহলে রাত্রি থেকে দিনে এবং দিন থেকে রাত্রিতে একটা আকস্মিক পরিবর্তন ঘটে যেতে পারতো।

এ প্রসঙ্গে সূরা যুমার এর ৫ম আয়াতে উল্লেখ আছে।

خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ يُكَوِّرُ اللَّيْلَ عَلَى النَّهَارِ وَيُكَوِّرُ النَّهَارَ عَلَى اللَّيْلِ .

অর্থ ঃ 'তিনি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীকে যথার্থভাবে সৃষ্টি করেছেন। তিনি রাতকে দিন দ্বারা আচ্ছাদিত করেন এবং দিনকে রাত দ্বারা আবৃত করেন।'

এ আয়াতে ব্যবহৃত আরবি শব্দটি হচ্ছে (يُكَوِّرُ) যার অর্থ 'আচ্ছাদিত করা' বা যেভাবে মাথায় চতুর্দিকে পাগড়ি প্যাঁচানো হয় সেভাবে কোনো জিনিসকে

প্যাঁচানো। দিনকে রাতে 'আচ্ছাদিত করা' বা কুণ্ডলী পাকানো যা পৃথিবী গোলাকার হলেই সম্ভব। তবে পৃথিবী বলের মতো পুরোপুরি গোলাকার নয় বরং ভূ-গোলকের মতো। উদাহরণস্বরূপ এটি মেরুর ন্যায় চ্যাপ্টা। পৃথিবীর আকারের বর্ণনা প্রসঙ্গে সূরা আন নাযিআত এর ৩০ তম আয়াতে বলা হয়েছে– وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَٰلِكَ دَحَاهَا

অর্থ ঃ আর আল্লাহ্ পৃথিবীকে এর পর বিস্তৃত করেছেন।

কুরআন এভাবেই পৃথিবীর আকৃতি বর্ণনা করেছে; যদিও কুরআন নাযিল হওয়ার সমসাময়িক প্রেক্ষাপটে পৃথিবী চ্যাপ্টা হওয়ার ধারণাটাই ছিল ব্যাপকভাবে প্রচলিত।

চাঁদের নিজস্ব আলো নেই

ইসলামের আবির্ভাবের পূর্বে সভ্যতাগুলো বিশ্বাস করতো যে চাঁদ তার নিজস্ব আলো বিকিরণ করে কিন্তু বিজ্ঞান এখন আমাদের বলছে যে চাঁদের নিজস্ব কোনো আলো নেই। চাঁদের আলো হচ্ছে প্রতিফলিত আলো। বিস্ময়কর মনে হলেও সত্য, কুরআন ১৪০০ বছর পূর্বে সূরা ফুরকান এর ৬১তম আয়াতের মাধ্যমে এ সত্যটি বলে দিয়েছিল—

تَبَارَكَ الَّذِي جَعَلَ فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَجَعَلَ فِيهَا سِرَاجًا وَقَمَرًا مُنِيرًا ۔

অর্থ ঃ কল্যাণময় তিনি, যিনি নভোমণ্ডলের রাশিচক্র সৃষ্টি করেছেন এবং তাতে রেখেছেন দীপ্তিময় সূর্য ও জ্যোতির্ময় চন্দ্র।

আল-কুরআনে সূর্যকে বোঝাতে (শামস) شَمْس শব্দটি ব্যবহৃত হয়। আবার سِرَاج (সিরাজ)–শব্দটি দ্বারাও সূর্যকে বুঝানো হয়ে থাকে, যার শাব্দিক অর্থ হলো বাতি বা মশাল। আবার কুরআনের কোথাও কোথাও সূর্যকে বুঝাতে سِرَاجًا وَهَّاجًا উল্লেখ করা হয়েছে। এর শাব্দিক অর্থ হলো, 'প্রজ্জ্বলিত বাতি'। আবার অন্য জায়গায় একই অর্থ বুঝানোর জন্য ضِيَاء শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে, যার অর্থ হচ্ছে 'উজ্জ্বল জ্যোতি'। তিনটি বর্ণনার সবগুলোই সূর্যের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। কারণ, সূর্য নিজ দহনক্রিয়ার মাধ্যমে প্রচণ্ড তাপ ও আলো উৎপন্ন করে। চাঁদের আরবি প্রতিশব্দ হচ্ছে قَمَر (কামার) কুরআন চাঁদকে বোঝাতে مُنِير (মুনির) শব্দটি উল্লেখ করেছে, যার অর্থ হলো' 'স্নিগ্ধ আলোদানকারী।' তাছাড়া চাঁদ এমন একটি নিষ্ক্রিয় বস্তু যা সূর্যের আলোকে প্রতিফলিত হয়– চাঁদের এ বৈশিষ্ট্যের সাথে কুরআনের বর্ণনা হুবহু মিলে যায়। কুরআনে একবারের জন্যও চাঁদকে سِرَاج (সিরাজ) وَهَّاج

(ওয়াহহাজ) বা ضِيَاء (দিয়া) হিসেবে এবং সূর্যকে نُور (নূর) বা مُنِير (মুনীর) হিসেবে উল্লেখ করা হয়নি। এতে বোঝা যায়, কুরআন সূর্যের আলো এবং চাঁদের আলোর পার্থক্য নির্দেশ করে।

মহান আল্লাহ সূরা ইউনূস এর ৫ম ও সূরা নূহ এর ১৫-১৬তম আয়াতে সূর্য এবং চাঁদের আলোর প্রকৃতি সম্পর্কে বলেছেন–

هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا ۔

অর্থ ঃ তিনিই সেই সত্তা, যিনি সূর্যকে উজ্জ্বল আলোকময় এবং চাঁদকে স্নিগ্ধ আলোয় আলোকিত করেছেন।

أَلَمْ تَرَوْا كَيْفَ خَلَقَ اللَّهُ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا ۔ وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا وَجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا ۔

অর্থ ঃ তোমরা কি দেখ না যে, আল্লাহ কীভাবে সপ্ত আকাশকে স্তরে স্তরে সৃষ্টি করেছেন এবং সেখানে চাঁদকে রেখেছেন আলোরূপে এবং সূর্যকে রেখেছেন প্রদীপরূপে?

সূর্যও আবর্তিত হয়

কুরআন নাযিলের পূর্বে ইউরোপীয় দার্শনিক ও বিজ্ঞানীরা বিশ্বাস করতেন 'পৃথিবী মহাবিশ্বের কেন্দ্রে স্থির অবস্থানে আছে এবং সূর্যসহ অন্য গ্রহগুলো আবর্তন করছে।' পাশ্চাত্যে খ্রিস্টপূর্ব দ্বিতীয় শতাব্দীতে টলেমির যুগ থেকে মহাবিশ্বের এ ভূকেন্দ্রিক ধারণা ব্যাপকভাবে প্রচলিত সত্য হিসেবে প্রতিষ্ঠিত ছিল। অবশেষে ১৫১২ খ্রিস্টাব্দে নিকোলাস কোপারনিকাস তার 'সূর্যকেন্দ্রিক গ্রহসংক্রান্ত গতিতত্ত্ব' প্রদান করেন। তত্ত্বটিতে উল্লেখ করা হয়েছে, 'সূর্য তার চারদিকে পরিভ্রমণরত গ্রহগুলোর কেন্দ্রে গতিহীন।' এরপর ১৬০৯ খ্রিস্টাব্দে জার্মান বিজ্ঞানী ইউহান্নাস কেপলার Astronamia Nova নামক গ্রন্থটি প্রকাশ করেন। এতে তিনি চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিলেন যে, গ্রহগুলো শুধু সূর্যের চারদিকে ডিম্বাকৃতির কক্ষপথেই পরিভ্রমণ করে না বরং সেগুলো নিজ নিজ অক্ষের ওপর অসম গতিতে আবর্তিত হয়। এ জ্ঞানের ফলে ইউরোপীয় বিজ্ঞানীদের পক্ষে দিন ও রাতের আবর্তনসহ সৌরজগতের বহু বিষয়ের ব্যাখ্যা দেয়া সম্ভব হয়।

এসব আবিষ্কারের পরেও বিশ্বাস করা হতো যে সূর্য স্থির - পৃথিবীর মতো নিজ অক্ষের ওপর আবর্তিত নয়। যতটা মনে পড়ে, স্কুলে ভূগোল পড়াকালীন এ ভুল ধারণাটি জন্মেছিল।

অথচ পবিত্র কুরআনের সূরা আম্বিয়া-এর ৩৩ তম আয়াতের প্রতি তাকালেই বিষয়টি পরিষ্কার হবে ঃ

وَهُوَ الَّذِى خَلَقَ الَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ ـ كُلٌّ فِىْ فَلَكٍ يَّسْبَحُوْنَ ـ

অর্থ ঃ তিনিই সৃষ্টি করেছেন রাত ও দিন এবং সূর্য ও চন্দ্র। সবাই নিজ কক্ষপথে বিচরণ করে।

উল্লিখিত আয়াতে ব্যবহৃত আরবি শব্দ হচ্ছে يَسْبَحُوْنَ (ইয়াসবাহুন)। শব্দটি سَبَحٌ (সাব হুন) শব্দ থেকে এসেছে। এ শব্দটি যেকোন প্রবহমান বস্তু থেকে সৃষ্ট গতিকে বুঝানোর জন্য ব্যবহৃত হয়ে থাকে। শব্দটিকে যদি আপনি মাটির ওপরে অবস্থানরত কোনো ব্যক্তির ক্ষেত্রে ব্যবহার করেন, তাহলে এর অর্থ এটা নয় যে, সে গড়াগড়ি দিচ্ছে বরং এর অর্থ হবে, সে হাঁটছে বা দৌড়াচ্ছে। আবার শব্দটিকে যদি পানিতে অবস্থানরত কোনো ব্যক্তির ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয়, তখন এর অর্থ এমন হবে না যে সে ভাসছে বরং এর অর্থ হবে, সে সাঁতার কাটছে। একইভাবে, আপনি যদি يسبحون (ইয়াসবাহুন) শব্দটি আকাশ বিষয়ক কোনো জিনিস যেমন সূর্য সম্পর্কে ব্যবহার করেন, তাহলে এটা শুধু মহাশূন্যের মধ্যদিয়ে ওড়াকেই বোঝাবে না, বরং এটি মহাশূন্যে আবর্তিত হয়– এমন অর্থও বোঝাবে।

অধিকাংশ স্কুলের পাঠ্য বইয়ে এ সত্যটি অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে যে, সূর্য তার নিজের কক্ষপথে আবর্তন করে। সূর্যের নিজ কক্ষে আবর্তনকে বোঝার জন্য টেবিলের ওপরে সূর্যের প্রতিকৃতিটি প্রদর্শন করা যেতে পারে না। যদি কেউ বিচার বুদ্ধিহীন হয় তাহলে সূর্যের প্রতিকৃতিটি পরীক্ষা করতে পারে। দেখা গেছে যে, সূর্যের নিজস্ব অবস্থানস্থল আছে যা প্রতি ২৫ দিনে একটি বৃত্তাকার গতি আবর্তন করে, অর্থাৎ নিজ কক্ষপথে আবর্তন করতে সূর্যের প্রায় ২৫ দিন সময় প্রয়োজন হয়। প্রকৃত পক্ষে, সূর্য প্রতি সেকেণ্ডে ২৪০ কিলোমিটার গতিতে মহাশূন্যের মধ্য দিয়ে ভ্রমণ করে এবং আমাদের ছায়াপথের কেন্দ্রের চারদিকে পুরোপুরি ঘুরে আসতে সময় লাগে প্রায় ২০০ মিলিয়ন বছর।

এ প্রসঙ্গে আল্লাহর সুস্পষ্ট বাণী রয়েছে সূরা ইয়াসিন এর ৪০ তম আয়াতে।

لَا الشَّمْسُ يَنْۢبَغِىْ لَهَا اَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا الَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ ـ وَكُلٌّ فِىْ فَلَكٍ يَّسْبَحُوْنَ ـ

অর্থ ঃ সূর্য নাগাল পেতে পারে না চাঁদের এবং রাত আগে চলে না দিনের। প্রত্যেকেই আপন আপন কক্ষপথে সন্তরণ করে।

এ আয়াতটি আধুনিক জ্যোতির্বিজ্ঞান কর্তৃক আবিষ্কৃত কিছু বৈজ্ঞানিক সত্যকে স্পষ্ট করেছে; যেমন– চাঁদ ও সূর্যের স্বতন্ত্র কক্ষপথের অস্তিত্ব এবং এগুলোর নিজস্ব গতিতে মহাশূন্যে পরিভ্রমণ।

সূর্য সৌরজগৎ নিয়ে যে নির্দিষ্ট স্থান লক্ষ্য করে চলছে সে স্থানটি আধুনিক জ্যোতির্বিজ্ঞান দ্বারা সঠিকভাবে আবিষ্কৃত হয়েছে। ঐ স্থানটির নাম দেয়া হয়েছে– 'সৌর শৃঙ্গ'(Solar horn)। প্রকৃতপক্ষে সৌরজগৎ মহাশূন্যে যে দিকে ধাবিত হয়, সে দিকটির অবস্থান বর্তমানে সঠিক ও দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত। আর সেটি হলো বৃহদাকারের তারকাপুঞ্জ (Alpha layer)।

পৃথিবীর চারদিকে ঘুরতে চাঁদের যতটুকু সময় লাগে ততটুকু সময়ে তা নিজ কক্ষপথে একবার আবর্তন করে। একবার পরিপূর্ণভাবে ঘুরে আসতে তার ২৯ দিন ৬ ঘণ্টা সময়ের প্রয়োজন হয়।

পবিত্র কুরআনের আয়াতসমূহের বৈজ্ঞানিক নির্ভুল তথ্যে কেউ আশ্চর্য না হয়ে পারে না। 'কুরআনের জ্ঞানের উৎস কী ছিল?' সে সম্পর্কে আমাদের ভাবনার অবকাশ আছে।

একদিন সূর্যও নিস্প্রভ হবে

সুদীর্ঘ ৫ বিলিয়ন বছর ধরে রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় সূর্যপৃষ্ঠে তাপ উৎপন্ন হচ্ছে। অনাগতকালের কোনো এক নির্দিষ্ট সময়ে এর সমাপ্তি ঘটবে। আর তখন পৃথিবীর সকল প্রাণীর অস্তিত্বের বিলুপ্তির মাধমে সূর্য হয়ে যাবে সম্পূর্ণ নিস্প্রভ। সূর্যের অস্তিত্বের অস্থায়িত্ব সম্পর্কে কুরআনুল কারীমের সূরা ইয়াসীন এর ৩৮তম আয়াতে ইরশাদ হচ্ছে–

وَالشَّمْسُ تَجْرِىْ لِمُسْتَقَرٍّ لَّهَا ـ ذٰلِكَ تَقْدِيْرُ الْعَزِيْزِ الْعَلِيْمِ ـ

অর্থ ঃ সূর্য তার নির্দিষ্ট অবস্থানে আবর্তন করে। এটা পরাক্রমশালী, সর্বজ্ঞ আল্লাহর নিয়ন্ত্রণ।

সূরা যুমার এর ৫ম আয়াতে আল্লাহ বলেছেন,

خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ بِالْحَقِّ ـ يُكَوِّرُ الَّيْلَ عَلَى النَّهَارِ وَيُكَوِّرُ النَّهَارَ عَلَى الَّيْلِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَّجْرِىْ لِاَجَلٍ مُّسَمًّى اَلَا هُوَ الْعَزِيْزُ الْغَفَّارُ ـ

অর্থ ঃ তিনি যথাযথভাবে আসমান ও যমীন সৃষ্টি করেছেন। তিনি রাতকে দিবস

দ্বারা এবং দিবসকে রাত দ্বারা আচ্ছাদিত করেন। আর তিনি সূর্য ও চন্দ্রকে নিয়মাধীন করেছেন, প্রত্যেকেই বিচরণ করে নির্দিষ্ট সময়কাল পর্যন্ত। জেনে রেখ, তিনি পরাক্রমশালী ও ক্ষমাশীল।

এখানে ব্যবহৃত হয়েছে আরবি শব্দ مُسْتَقَرٍّ (মুসতাকার) - যার অর্থ, 'একটি নির্দিষ্ট স্থান' বা 'একটি নির্দিষ্ট সময়'। এভাবে কুরআন বলছে সূর্য একটি নির্ধারিত স্থানের দিকে আবর্তন করছে যা চলতে থাকবে পূর্ব নির্ধারিত সময় পর্যন্ত। এর অর্থ হলো, একদিন সূর্যের অবসান ঘটবে। সূরা তাকভির-এর ১ম আয়াতেই আল্লাহ এ বিষয়টি অত্যন্ত সাবলীল ভাষায় ঘোষণা করেছেন— إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ

অর্থ ঃ যখন সূর্য নিষ্প্রভ হয়ে যাবে।

মহাশূন্যে ছায়াপথ ও বস্তুর অস্তিত্ব

সভ্যতার প্রথম দিকে জ্যোতির্বিজ্ঞান পদ্ধতির সুসংগঠিত ধারার বাইরের স্থানকে শূন্য মনে করা হত। পরবর্তীকালে জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা মহাশূন্যে বস্তুর সেতু আবিষ্কার করেন। বস্তুর এ সেতুগুলোকে প্লাজমা বলা হয়, যা সমান সংখ্যক মুক্ত ইলেকট্রন ও ধনাত্মক আয়নবিশিষ্ট সম্পূর্ণ আয়নিত গ্যাস দ্বারা তৈরি। অধিকাংশ সময়ে প্লাজমাকে বস্তুর চতুর্থ অবস্থা বলা হয় (অন্য পরিচিত তিনটি অবস্থা হলো- কঠিন, তরল এবং গ্যাসীয়)। কুরআন মহাশূন্যে এ বস্তুর উপস্থিতি সম্পর্কে সূরা ফুরকান এর ৫৯তম আয়াতে বলেছে- الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا

অর্থ ঃ তিনিই সেই সত্তা যিনি আসমান ও যমীন এবং উভয়ের মাঝে অবস্থিত সব কিছু সৃষ্টি করেছেন।

সুতরাং মহাশূন্যে ছায়াপথ ও বস্তুর অস্তিত্ব সম্পর্কে ১৪০০ বছর পূর্বেই কুরআনের উল্লিখিত আয়াতের মাধ্যমে জানা গিয়েছিল।

মহাবিশ্ব সম্প্রসারণশীল

মার্কিন জ্যোতির্বিজ্ঞানী এডউইন হাবল ১৯২৫ সালে পর্যবেক্ষণমূলক সাক্ষ্যপ্রমাণের মাধ্যমে উপস্থাপন করেন যে, সকল ছায়াপথ একে অপর থেকে অপসৃত হচ্ছে- যা ইঙ্গিত দিচ্ছে মহাবিশ্ব সম্প্রসারিত হচ্ছে। মহাবিশ্বের সম্প্রসারণ বর্তমানে একটি সুপ্রতিষ্ঠিত বৈজ্ঞানিক সত্য। মহাবিশ্বের প্রকৃতি সম্পর্কে কুরআনও ঐ একই কথা বলেছে। সূরা যারিয়াত এর ৪৭তম আয়াতে বলা হয়েছে-

وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ۔

অর্থ ঃ আমি স্বহস্তে আকাশ নির্মাণ করেছি এবং আমিই এর সম্প্রসারণকারী।

আরবি শব্দ مُوسِعُونَ (মুসিউন)-এর যথার্থ অনুবাদ হলো, 'সম্প্রসারণকারী' এবং এটা মহাবিশ্বের ব্যাপক সম্প্রসারণশীলতার দিকেই ইঙ্গিত দেয়।

বিজ্ঞানী স্টিফেন হকিং তাঁর 'A Brief History of Time' নামক গ্রন্থে বলেছেন, 'মহাবিশ্ব সম্প্রসারিত হচ্ছে- এ আবিষ্কারটি বিংশ শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ বুদ্ধিবৃত্তিক বিপ্লব সমূহের অন্যতম।' কিন্তু কুরআন ১৪শ বছর আগে এমন সময়ে মহাবিশ্বের সম্প্রসারণের কথা বলেছে, যখন মানুষ সামান্য টেলিফোনও আবিষ্কার করতে পারেনি। কেউ হয়তো বলতে পারে, আরবরা জ্যোতির্বিদ্যায় অগ্রসর ছিল বলে কুরআনে জ্যোতির্বিজ্ঞান সম্পর্কিত সত্যের উপস্থিতি অবাক হওয়ার বিষয় নয়। জ্যোতির্বিদ্যায় আরবদের অগ্রসরতার বিষয়টি স্বীকার করার ক্ষেত্রে তারা সঠিক। তবে তারা এ সত্য উপলব্ধি করতে ব্যর্থ হয় যে, জ্যোতির্বিদ্যায় আরবদের অগ্রসরতার কয়েক শতাব্দী পূর্বেই কুরআন অবতীর্ণ হয়।

এছাড়া আরবরা তাদের বৈজ্ঞানিক অগ্রসরতার সুউচ্চ শিখরে আরোহণ করলেও 'বিগ ব্যাঙ' -এর কারণে মহাবিশ্বের উৎপত্তি ছাড়াও ওপরে আলোচিত অনেক বৈজ্ঞানিক সত্য সম্পর্কে অবগত ছিল না। জ্যোতির্বিদ্যায় অগ্রগতির কারণে কুরআনে বর্ণিত বৈজ্ঞানিক সত্যসমূহে আরবগণের কোনো অবদান ছিল না। আসলে বিপরীতটাই সত্য। আর তা হলো, কুরআনে জ্যোতির্বিজ্ঞান বিষয়ে জ্ঞানগর্ভ আলোচনা রয়েছে বলেই আরবগণ জ্যোতির্বিজ্ঞানে অগ্রগতি অর্জন করেছিল।

পদার্থবিজ্ঞান

(Physics)

ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র পরমাণুর অস্তিত্ব

আদিযুগে 'পরমাণুবাদ' নামে একটি সুপরিচিত তত্ত্ব ব্যাপকভাবে স্বীকৃত হয়েছিল। খ্রিস্টপূর্ব ২৩ শতাব্দীতে ডেমোক্রিটাস নামে এক গ্রিক দার্শনিক এ তত্ত্বটি উদ্ভাবন করেছিলেন। ডেমোক্রিটাস এবং তার পরবর্তী লোকজন মনে করতো যে বস্তুর ক্ষুদ্রতম একক হচ্ছে পরমাণু। আরবরাও একই ধরনের বিশ্বাস পোষণ করতো। আরবি শব্দ ذرة (জাররাহ)-এর প্রচলিত অর্থ হচ্ছে পরমাণু। অতি সম্প্রতি বিজ্ঞান আবিষ্কার করেছে, পরমাণুকেও বিভক্ত করা যায়। পরমাণুকেও যে বিভক্ত করা যায় তা বিংশ শতাব্দীর আবিষ্কার। আরবদের কারো ১৪ শতাব্দীকাল আগে বিষয়টি জানা

ছিল না। কারণ ذرة (জাররাহ) ছিল একটি সীমা যা কেউ অতিক্রম করতে পারতো না। কুরআনের সূরা সাবা-এর ৩য় আয়াত ذرة শব্দের এ সীমা স্বীকার করে না।

وَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَا تَأْتِيْنَا السَّاعَةُ ـ قُلْ بَلٰى وَرَبِّيْ لَتَأْتِيَنَّكُمْ ـ عٰلِمُ الْغَيْبِ لَا يَعْزُبُ عَنْهُ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ فِي السَّمٰوٰتِ وَلَا فِي الْاَرْضِ وَلَا اَصْغَرُ مِنْ ذٰلِكَ وَلَا اَكْبَرُ اِلَّا فِيْ كِتٰبٍ مُّبِيْنٍ ـ

অর্থ : কাফিরগণ বলে, কিয়ামত আমাদের নিকট আসবে না। হে নবী! আপনি বলুন, না, আমার রবের শপথ! তোমাদের নিকট তা অবশ্য অবশ্যই আসবে। তিনি যাবতীয় অদৃশ্যের জ্ঞানী, তাঁর থেকে আসমান ও যমীনে লুক্কায়িত নেই ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র পরমাণু; না তার থেকে ছোট আর না তার থেকে বড়– সবই আছে (লওহে মাহফুজ নামক) এক সুস্পষ্ট কিতাবে।

এ আয়াতে মহান আল্লাহর সর্বজ্ঞান, তার প্রকাশ্য ও গোপন সকল কিছুর জ্ঞানের নির্দেশ করে। তারপর এটি বলে যে আল্লাহ পরমাণু অপেক্ষা ক্ষুদ্রতর সবকিছুর ব্যাপারে সচেতন। এভাবে এ আয়াতটি সুস্পষ্টভাবে প্রমাণ করে, পরমাণুর চেয়ে ক্ষুদ্রতম কোনো কিছুর অস্তিত্ব থাকা সম্ভব। অতি সম্প্রতি এ সত্যটি আধুনিক বিজ্ঞান দ্বারা আবিষ্কৃত হয়েছে।

পানিবিজ্ঞান
(Hydrology)

পানিচক্র

পানিচক্রের বর্তমান ধারণাটি ১৫০০ খ্রিষ্টাব্দে সর্বপ্রথম ব্যাখ্যা করেন বার্নাড পলিসি। তিনি সাগর থেকে পানির বাষ্প হয়ে উড়ে যাওয়া এবং পরে তা ঠাণ্ডা হয়ে মেঘে পরিণত হওয়ার প্রক্রিয়াটি বিশ্লেষণ করেন। মেঘমালা সাগর থেকে দূরবর্তী ভূ-খণ্ডের ওপর ঘনীভূত হয় এবং ক্রমান্বয়ে তা বৃষ্টি আকারে নিচে পতিত হয়। বৃষ্টির পানি খাল-বিল ও নদ-নদীতে মিশে এবং অব্যাহত নিয়মে আবার সাগরে ফিরে আসে। খ্রিস্টপূর্ব ৭ম শতাব্দীতে মিলেটুসের থেলেস এ মতবাদ পোষণ করতেন যে, সমুদ্রের উপরিভাগের ছিটানো পানিকণাকে বাতাস ধারণ করে উপরে তুলে নেয় এবং সমুদ্র দূরবর্তী স্থানে নিয়ে তা বৃষ্টি আকারে বর্ষণ করে।

প্রাচীনকালের লোকজন ভূ-গর্ভস্থ পানির উৎস সম্পর্কে অবগত ছিল না। তারা ভাবতো, বাতাসের ধাক্কায় সাগরের পানি সজোরে মহাদেশের ভেতর এসে পতিত হয়। এমনকি অষ্টাদশ শতাব্দীর বিখ্যাত চিন্তাবিদ ডেকার্তও এই একই ধারণা পোষণ করতেন। উনবিংশ শতাব্দিতে এরিস্টটলের তত্ত্ব সর্বক্ষেত্রে প্রচলিত ও স্বীকৃত ছিল। এ তত্ত্ব অনুসারে, পাহাড়ের ঠাণ্ডা গভীর গুহায় পানি ঘনীভূত হয় এবং মাটির নিচ দিয়ে প্রবাহিত হয়ে হ্রদ ও ঝর্ণাগুলোকে পানি সরবরাহ করে। বর্তমানে আমরা জানি, বৃষ্টির পানি মাটির ফাটল দিয়ে ভেতরে চুইয়ে পড়ার ফলে ঐ পানি পাওয়া যায়।

কুরআনের সূরা যুমার এর ২১তম আয়াতে পানিচক্রের বর্ণনা দেয়া হয়েছে। বলা হয়েছে–

اَلَمْ تَرَ اَنَّ اللّٰهَ اَنْزَلَ مِنَ السَّمَاۤءِ مَاۤءً فَسَلَكَهٗ يَنَابِيْعَ فِي الْاَرْضِ ثُمَّ يُخْرِجُ بِهٖ زَرْعًا مُّخْتَلِفًا اَلْوَانُهٗ ـ

অর্থ : তুমি কি দেখনি যে, আল্লাহ আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করেছেন, তারপর সে পানি যমীনের ঝর্ণাসমূহে প্রবাহিত করেছেন, এরপর তা দ্বারা বিভিন্ন রঙের ফসল উৎপন্ন করেন।

পবিত্র কুরআনের সূরা রূম-এর ২৪তম আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে।

وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاۤءِ مَاۤءً فَيُحْيٖ بِهِ الْاَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّعْقِلُوْنَ ـ

অর্থ : তিনি আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করেন এবং এর দ্বারা মৃত্যুর পর ভূমিকে পুনরুজ্জীবিত করেন। নিশ্চয়ই এতে বুদ্ধিমান লোকদের জন্য নিদর্শনাবলি রয়েছে।

সূরা মুমিনুন এর ১৮তম আয়াতে উল্লেখ আছে—

وَاَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاۤءِ مَاۤءً بِقَدَرٍ فَاَسْكَنّٰهُ فِي الْاَرْضِ وَاِنَّا عَلٰى ذَهَابٍ بِهٖ لَقٰدِرُوْنَ ـ

অর্থ : আমি আকাশ থেকে পরিমাণ মত পানি বর্ষণ করে থাকি, তারপর তাকে যমীনে সংরক্ষণ করি এবং আমি তা অপসারণ করতে সক্ষম।

এমন অন্য কোনো বই ১৪০০ বছর পূর্বে ছিল না যা পানিচক্রের এমন নির্ভুল বর্ণনা দেয়।

বাতাস মেঘমালাকে ঘনীভূত করে

পবিত্র কুরআন এর সূরা হিজর এর ২২তম আয়াতে বলা হয়েছে–

وَاَرْسَلْنَا الرِّيٰحَ لَوَاقِحَ فَاَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَآءِ مَآءً فَاَسْقَيْنٰكُمُوْهُ ۔

অর্থ ঃ আমি বৃষ্টিগর্ভ বাতাস পরিচালনা করি, অতঃপর আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করি, অতঃপর তোমাদেরকে তা পান করাই।

এখানে ব্যবহৃত আরবি لَوَاقِح (লাওয়াকিহ্) শব্দটি لَقِح (লাকিহ্) শব্দের বহুবচন এবং لَقَح (লাক্বাহ্) শব্দ থেকে এর উৎপত্তি। যার অর্থ পূর্ণ করা, গর্ভবতী করা কিংবা উর্বর করা। এখানে পূর্ণ করার অর্থ হচ্ছে, বাতাস মেঘমালাকে একসাথে ধাক্কা দিয়ে ঘনীভূত করে। যার ফলে আকাশে বিজলী চমকায় এবং বৃষ্টি শুরু হয়।

কুরআনে সূরা রূম এর ৪৮তম আয়াতে একই রকম বর্ণনা রয়েছে—

اَللّٰهُ الَّذِىْ يُرْسِلُ الرِّيٰحَ فَتُثِيْرُ سَحَابًا فَيَبْسُطُهٗ فِى السَّمَآءِ كَيْفَ يَشَآءُ وَيَجْعَلُهٗ كِسَفًا فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلٰلِهٖ ۚ فَاِذَآ اَصَابَ بِهٖ مَنْ يَّشَآءُ مِنْ عِبَادِهٖۤ اِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُوْنَ ۔

অর্থ ঃ তিনি আল্লাহ, যিনি বায়ু প্রেরণ করেন, অতঃপর তা মেঘমালাকে সঞ্চালিত করে। অতঃপর তিনি মেঘমালাকে যেভাবে ইচ্ছা আকাশে ছড়িয়ে দেন এবং তাকে স্তরে স্তরে রাখেন। এরপর তুমি দেখতে পাও তার মধ্য থেকে নির্গত হয় বৃষ্টিধারা। তিনি তার বান্দাদের মধ্যে যাদেরকে ইচ্ছা পৌছান; তখন তারা আনন্দিত হয়।

সূরা নূর এর ৪৩তম আয়াতে বলা হয়েছে–

اَلَمْ تَرَ اَنَّ اللّٰهَ يُزْجِىْ سَحَابًا ثُمَّ يُؤَلِّفُ بَيْنَهٗ ثُمَّ يَجْعَلُهٗ رُكَامًا فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلٰلِهٖ ۚ وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَآءِ مِنْ جِبَالٍ فِيْهَا مِنْۢ بَرَدٍ فَيُصِيْبُ بِهٖ مَنْ يَّشَآءُ وَيَصْرِفُهٗ عَنْ مَّنْ يَّشَآءُ ؕ يَكَادُ سَنَا بَرْقِهٖ يَذْهَبُ بِالْاَبْصَارِ ۔

অর্থ ঃ তুমি কি দেখ না যে, আল্লাহ মেঘমালকে সঞ্চারিত করেন, অতঃপর তাকে পুঞ্জিভূত করেন। অতঃপর তাকে স্তরে স্তরে রাখেন। তারপর তুমি দেখ যে, তার মধ্য থেকে বারিধারা নির্গত হয়। তিনি আকাশস্থিত শিলাস্তূপ থেকে শিলা বর্ষণ করেন এবং তা দ্বারা যাকে ইচ্ছা আঘাত করেন এবং যার কাছ থেকে ইচ্ছা তা অন্যদিকে ফিরিয়ে দেন। তার বিদ্যুৎ ঝলক দৃষ্টিশক্তিকে যেন বিলীন করে দিতে চায়।

সূরা আ'রাফ এর ৫৭তম আয়াতে উল্লেখ আছে–

وَهُوَ الَّذِىْ يُرْسِلُ الرِّيٰحَ بُشْرًۢا بَيْنَ يَدَىْ رَحْمَتِهٖ ؕ حَتّٰۤى اِذَآ اَقَلَّتْ سَحَابًا ثِقَالًا سُقْنٰهُ لِبَلَدٍ مَّيِّتٍ فَاَنْزَلْنَا بِهِ الْمَآءَ فَاَخْرَجْنَا بِهٖ مِنْ كُلِّ الثَّمَرٰتِ ؕ كَذٰلِكَ نُخْرِجُ الْمَوْتٰى لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ ۔

অর্থ ঃ তিনিই বৃষ্টির পূর্বে সুসংবাদবাহি বায়ু প্রেরণ করেন। এমনকি যখন বায়ুরাশি পানিপূর্ণ মেঘমালা বয়ে আনে, তখন আমি এ মেঘমালাকে একটি মৃত ভূ-খণ্ডের দিকে পাঠিয়ে দেই। অতঃপর এ মেঘ থেকে বৃষ্টিধারা বর্ষণ করি। অতঃপর পানি দ্বারা সব রকমের ফল উৎপন্ন করি। এমনিভাবে মৃতদেরকে বের করব যাতে তোমরা চিন্তা কর।

সূরা ত্বারিক এর ১১তম আয়াতে উল্লেখ আছে— وَالسَّمَآءِ ذَاتِ الرَّجْعِ

অর্থ ঃ শপথ আসমানের যা ধারণ করে বৃষ্টি।

পানিবিজ্ঞানের আধুনিক থিওরীর সাথে কুরআনের বর্ণনাগুলো নিশ্চিতভাবে নির্ভুল এবং যথার্থভাবে একমত। পবিত্র কুরআনের বিভিন্ন আয়াতে পানিচক্রের বর্ণনা রয়েছে।

সূরা রা'দ-এর ১৭ তম আয়াতে ঘোষণা করা হয়েছে—

اَنْزَلَ مِنَ السَّمَآءِ مَآءً فَسَالَتْ اَوْدِيَةٌۢ بِقَدَرِهَا فَاحْتَمَلَ السَّيْلُ زَبَدًا رَّابِيًا ؕ وَمِمَّا يُوْقِدُوْنَ عَلَيْهِ فِى النَّارِ ابْتِغَآءَ حِلْيَةٍ اَوْ مَتَاعٍ زَبَدٌ مِّثْلُهٗ ؕ كَذٰلِكَ يَضْرِبُ اللّٰهُ الْحَقَّ وَالْبَاطِلَ ؕ فَاَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَآءً ۚ وَاَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِى الْاَرْضِ ؕ كَذٰلِكَ يَضْرِبُ اللّٰهُ الْاَمْثَالَ ۔

অর্থ ঃ তিনি আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করেন। অতঃপর স্রোতধারা প্রবাহিত হতে থাকে নিজ নিজ পরিমাণ অনুযায়ী। অতঃপর স্রোতধারা স্ফীত ফেনারাশি ওপরে নিয়ে আসে এইরূপ আবর্জনা উপরিভাগে আসে যখন অলংকার অথবা তৈজসপত্র নির্মাণের উদ্দেশ্যে কিছু অগ্নিতে উত্তপ্ত করা হয়, এইভাবে আল্লাহ সত্য ও অসত্যের দৃষ্টান্ত দিয়ে থাকেন। যা আবর্জনা তা ফেলে দেয়া হয় আর যা মানুষের উপকারে আসে তা জমিতে থেকে যায়। এভাবে আল্লাহ উপমা দিয়ে থাকেন।

এ সম্পর্কে সূরা ফুরকান এর ৪৮-৪৯তম আয়াতে–

وَهُوَ الَّذِيْ أَرْسَلَ الرِّيْحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُوْرًا ۔ لِنُحْيِيَ بِهِ بَلْدَةً مَّيْتًا وَّنُسْقِيَهُ مِمَّا خَلَقْنَا أَنْعَامًا وَّأَنَاسِيَّ كَثِيْرًا ۔

অর্থ ঃ তিনিই রহমতের সময়ে বাতাসকে সুসংবাদবাহিরূপে প্রেরণ করেন। আর আকাশ থেকে আমরা পবিত্রতা অর্জনের জন্য পানি বর্ষণ করি, তা দ্বারা মৃত ভূখণ্ডকে জীবিত করার জন্য এবং আমার সৃষ্ট জীবজন্তু ও মানুষের তৃষ্ণা মেটানোর জন্যে।

সূরা ফাতির এর ৯ম আয়াতে বলা হয়েছে—

وَاللّٰهُ الَّذِيْ أَرْسَلَ الرِّيْحَ فَتُثِيْرُ سَحَابًا إِلَى بَلَدٍ مَّيِّتٍ فَأَحْيَيْنَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا كَذٰلِكَ النُّشُوْرُ ۔

অর্থ ঃ আর আল্লাহ হচ্ছেন সেই সত্তা যিনি বায়ু প্রেরণ করেন, এরপর সে বায়ু মেঘমালাকে সঞ্চালিত করে। অতঃপর আমি এটাকে মৃত ভূখণ্ডের দিকে পরিচালিত করি। এরপর এটা দ্বারা সে ভূ-খণ্ডকে তার মৃত্যুর পর জীবিত করি। একইভাবে হবে পুনরুত্থান।

সূরা ইয়াসিন-এর ৩৪ নম্বর আয়াতে বলা হয়েছে,—

وَجَعَلْنَا فِيْهَا جَنّٰتٍ مِّنْ نَّخِيْلٍ وَّأَعْنَابٍ وَّفَجَّرْنَا فِيْهَا مِنَ الْعُيُوْنِ ۔

অর্থ ঃ এতে আমি সৃষ্টি করি খর্জুর ও আঙ্গুরের উদ্যান এবং এতে উৎসারিত করি প্রস্রবণ।

সূরা জাসিয়া-এর ৫ম আয়াতে উল্লেখ আছে—

وَمَا أَنْزَلَ اللّٰهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ رِّزْقٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَتَصْرِيْفِ الرِّيْحِ اٰيٰتٌ لِّقَوْمٍ يَّعْقِلُوْنَ ۔

অর্থ ঃ আর আল্লাহ আকাশ থেকে যে বৃষ্টি বর্ষণ করেন এরপর পৃথিবীকে তার মৃত্যুর পর জীবিত করেন এতে এবং বায়ুর পরিবর্তনে বুদ্ধিমানদের জন্য নিদর্শনাবলি রয়েছে।

সূরা ক্বাফ এর ৯-১১তম আয়াতে আরও বলা হয়েছে—

وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُّبٰرَكًا فَأَنْبَتْنَا بِهِ جَنّٰتٍ وَّحَبَّ الْحَصِيْدِ ۔ وَالنَّخْلَ بٰسِقٰتٍ لَّهَا طَلْعٌ نَّضِيْدٌ ۔ رِزْقًا لِّلْعِبَادِ وَأَحْيَيْنَا بِهِ بَلْدَةً مَّيْتًا كَذٰلِكَ الْخُرُوْجُ ۔

অর্থ ঃ আমি কল্যাণময় পানি বর্ষণ করি এবং এর দ্বারা বাগান ও শস্য উৎপন্ন করি, যেগুলোর ফসল আহরণ করা হয় এবং দীর্ঘ খেজুর বৃক্ষ, যাতে আছে গুচ্ছ গুচ্ছ খেজুর, বান্দাদের জীবিকাস্বরূপ এবং বৃষ্টি দ্বারা আমি মৃত ভূ-খণ্ডকে জীবিত করি। আর এভাবেই পুনরুত্থান ঘটবে।

সূরা ওয়াক্বিয়ার ৬৮ নম্বর আয়াতে বলা হয়েছে—

أَفَرَءَيْتُمُ الْمَاءَ الَّذِيْ تَشْرَبُوْنَ ۔ ءَأَنْتُمْ أَنْزَلْتُمُوْهُ مِنَ الْمُزْنِ أَمْ نَحْنُ الْمُنْزِلُوْنَ ۔ لَوْ نَشَاءُ جَعَلْنٰهُ أُجَاجًا فَلَوْلَا تَشْكُرُوْنَ ۔

অর্থ ঃ তোমরা যে পানি পান কর, সে সম্পর্কে ভেবে দেখেছ কি? তোমরা তা মেঘ থেকে নামিয়ে আন, না আমি বর্ষণ করি? ইচ্ছা করলে আমি একে লোনা করে দিতে পারি। অতঃপর তোমরা কেন কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর না।

ভূ-তত্ত্ব
(Geology)

পাহাড়-পর্বতগুলো তাঁবুর পেরেক সদৃশ

ভূ-তত্ত্বে 'ভাঁজ' বিষয়টি একটি আধুনিক আবিষ্কৃত সত্য। ভাঁজ বিষয়টি পাহাড়-পর্বতের বিন্যাসের জন্য দায়ী। পৃথিবীর যে কঠিন পৃষ্ঠের ওপর আমরা বাস করি, তা শক্ত খোসার মতো অথচ এর গভীরের স্তরগুলো উত্তপ্ত ও তরল। ফলে যে কোনো প্রাণীর জন্য তা বসবাসের অনুপযোগী। এটাও জানা যায় যে, পাহাড়-পর্বতের স্থায়িত্ব ভাঁজ করার মতো বিস্ময়কর ঘটনার সাথে সম্পৃক্ত। কারণ অস্থিতিশীল অবস্থা থেকে পরিবর্তনের মাধ্যমে পাহাড়-পর্বতের ভিত্তি স্থাপন করাই হলো এ ভাঁজগুলোর উদ্দেশ্য।

ভূ-তত্ত্ববিদদের মতে, পৃথিবীর ব্যাসার্ধ প্রায় ৪৫৫০ মাইল এবং ভূ-পৃষ্ঠের যে কঠিন উপরিভাগে আমরা বাস করি তা অত্যন্ত পাতলা। এর বিস্তার ১ মাইল থেকে ৩০

মাইল পর্যন্ত বিস্তৃত। যেহেতু ভূ-পৃষ্ঠের শক্ত আবরণটি পাতলা সেহেতু এর আন্দোলিত হওয়ার সম্ভাবনা অনেক। পাহাড়গুলো খুঁটি কিংবা তাঁবুর পেরেকের মতো ভূ-পৃষ্ঠকে ধরে রাখে এবং একে স্থিতি অবস্থা দান করে।

কুরআনে সূরা নাবা-এর ৬ষ্ঠ থেকে ৭ম আয়াতে হুবহু একথাই বলা হয়েছে—

أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهٰدًا ـ وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا ـ

অর্থ ঃ আমি কি জমিনকে বিছানা এবং পাহাড়কে পেরেক বানাইনি?

এখানে ব্যবহৃত আরবি শব্দ اوتادا (আওতাদা) -এর অর্থ হচ্ছে পেরেক বা খুঁটি (বিশেষ করে তাঁবু খাটাতে ব্যবহৃত)। এগুলো হলো ভূ-তাত্ত্বিক ভাঁজের ভিত্।

বিশ্বের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে 'Earth' নামক গ্রন্থটি ভূ-তত্ত্ব বিষয়ে প্রাথমিক ও মৌলিক রেফারেন্স বই হিসেবে পাঠ্য। এ বইয়ের অন্যতম লেখক হলেন ড. ফ্রাঙ্ক প্রেস, যিনি ১২ বছর ধরে আমেরিকার বিজ্ঞান একাডেমির প্রেসিডেন্ট এবং প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট জিমি কার্টারের বিজ্ঞান বিষয়ক উপদেষ্টা ছিলেন। এ বইতে তিনি ব্যাখ্যা করেছেন যে, পাহাড়-পর্বত হচ্ছে পেরেক আকৃতি বিশিষ্ট এবং এগুলো অবিভক্ত বস্তুর এক ক্ষুদ্র অংশমাত্র, যার মূল মাটির গভীরে প্রথিত। ড. প্রেসের মতে, ভূ-পৃষ্ঠের কঠিন আবরণকে স্থিতিশীল রাখতে পাহাড়-পর্বতগুলো অপরিহার্য ভূমিকা পালন করে।

কুরআন পাহাড়-পর্বতের উপযোগিতা পরিষ্কারভাবে বর্ণনা করে বলছে, তা (পাহাড়) পৃথিবীকে কম্পন থেকে রক্ষা করে।

সূরা আম্বিয়া-এর ৩১তম আয়াতে বলা হয়েছে—

وَجَعَلْنَا فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَنْ تَمِيدَ بِهِمْ ـ

অর্থ ঃ আমি পৃথিবীতে ভারী বোঝা রেখে দিয়েছি- যাতে তাদেরকে নিয়ে পৃথিবী ঝুঁকে না পড়ে।

সূরা লুকমান এর ১০ম আয়াতে উল্লেখ আছে—

خَلَقَ السَّمٰوٰتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا وَأَلْقٰى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَنْ تَمِيدَ بِكُمْ ـ

অর্থ ঃ তিনি আসমানকে খুঁটিবিহীন তৈরি করেছেন যা তোমরা দেখতে পাচ্ছ। আর পৃথিবীতে পাহাড় সৃষ্টি করেছেন যাতে তোমাদেরকে নিয়ে পৃথিবী ঝুঁকে না পড়ে।'

এছাড়াও সূরা নাহল-এর ১৫তম আয়াতে ঘোষণা করা হয়েছে—

وَأَلْقٰى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَنْ تَمِيدَ بِكُمْ وَأَنْهٰرًا وَسُبُلًا لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ـ

অর্থ ঃ আর তিনি পৃথিবীতে পাহাড়-পর্বত স্থাপন করেছেন যাতে তা তোমাদেরকে নিয়ে ঝুঁকে না পড়ে এবং আরও সৃষ্টি করেছেন নদ-নদী ও পথ; যাতে তোমরা তোমাদের গন্তব্যস্থলে পৌঁছতে পার।

কুরআনের বর্ণনা সম্পূর্ণরূপে আধুনিক ভূ-তাত্ত্বিক তথ্যাদির সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ।

পাহাড়-পর্বত দৃঢ়ভাবে প্রোথিত

ভূ-পৃষ্ঠের উপরিভাগ অসংখ্য মজবুত ভূ-স্তরে (প্লেট) বিভক্ত, যেগুলোর ঘনত্ব প্রায় ১০০ কিলোমিটার। ভূ-স্তরগুলো আংশিক গলিত অঞ্চলে ভাসমান, যাকে বলা হয় এসথেনোসফিয়ার (Aesthenosphere)। ভূ-স্তরগুলোর প্রান্তসীমায় পাহাড়-পর্বত গড়া শুরু হয়। পৃথিবীর কঠিন আবরণ সমুদ্রের ৫ কিলোমিটার নিচ পর্যন্ত বিস্তৃত। প্রায় ৩৫ কিলোমিটার মোটা সমতল মহাদেশীয় পৃষ্ঠগুলোর নিচ এবং প্রায় ৮০ কিলোমিটার মোটা সুউচ্চ পর্বতমালার নিচ পর্যন্ত বিস্তৃত। এ সুদৃঢ় ভিত্তির ওপর পাহাড়-পর্বত দাঁড়িয়ে আছে। কুরআনও পাহাড়-পর্বতের শক্তিশালী ভিত্তির কথা বলে।

সূরা নাযিআত এর ৩২তম আয়াতে বলা হয়েছে— وَالْجِبَالَ أَرْسٰهَا

অর্থ ঃ আর তিনি পাহাড়-পর্বতকে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করেছেন।

সূরা গাশিয়াহ-এর ১৯তম আয়াতে বলা হয়েছে— وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ

অর্থ ঃ (তারা কি দেখে না) পাহাড়ের দিকে, তা কীভাবে স্থাপন করা হয়েছে।

সূরা লুকমান-এর ১০ম আয়াতে উল্লেখ আছে

وَأَلْقٰى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَنْ تَمِيدَ بِكُمْ ـ

অর্থ ঃ তিনি পৃথিবীতে পবর্তমালা স্থাপন করেছেন, যাতে এটি তোমাদের নিয়ে ঝুঁকে না পড়ে।

এ ছাড়াও সূরা নাহল-এর ১৫তম আয়াতে বলা হয়েছে—

وَأَلْقٰى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَنْ تَمِيدَ بِكُمْ ـ

অর্থ ঃ আর তিনি পৃথিবীর ওপর মজবুত পাহাড় রেখেছেন যেন কখনও তা তোমাদেরকে নিয়ে হেলে দুলে না পড়ে।

সমুদ্রবিজ্ঞান
(Oceanology)

সুপেয় ও লোনা পানির পার্থক্য

সূরা আর-রাহমান এর ১৯-২০তম আয়াতে মহান আল্লাহ ঘোষণা করেছেন–

مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيٰنِ . بَيْنَهُمَا بَرْزَخٌ لَّا يَبْغِيٰنِ .

অর্থ ঃ তিনি পাশাপাশি দুই প্রকার সাগর প্রবাহিত করেছেন, উভয়ের মাঝখানে রয়েছে অন্তরায়, যা তারা অতিক্রম করতে পারে না।

আরবি بَرْزَخٌ (বারযাখ) শব্দটির অর্থ হচ্ছে আড়াল বা অন্তরায়। এ অন্তরায় কোনো শারীরিক বিভাজন নয়। আরবি শব্দ مَرَجَ (মারাজ)-এর শাব্দিক অর্থ হচ্ছে প্রবহিত করা প্রাথমিক যুগের তাফসিরকারগণ পানির দুটি ধারায় দুটি বিপরীত অর্থের ব্যাখ্যা করতে অপারগ ছিলেন। অর্থাৎ, কীভাবে তারা মিশে একাকার হয়ে যায়, যদিও উভয়ের মধ্যে রয়েছে আড়াল। আধুনিক বিজ্ঞান আবিষ্কার করেছে যে, যেখানে দুটি ভিন্ন সমুদ্র এসে একত্রে মিলিত হয়, সেখানে উভয়ের মধ্যে একটি প্রতিবন্ধক বা অন্তরায় বিদ্যমান। এ অন্তরায় দুটি সমুদ্রকে বিভক্ত করে। ফলে প্রত্যেক সমুদ্রের নিজস্ব তাপমাত্রা, লবণাক্ততা এবং ঘনত্ব অক্ষুণ্ন থাকে। যারা সমুদ্র গবেষক তাদের জন্য এ আয়াতে আরও উন্নততর ব্যাখ্যা প্রদানের ভালো সুযোগ রয়েছে। দুটি সাগরের মধ্যে প্রবাহমান ঢালু পানির অদৃশ্য অন্তরায় আছে যার মধ্য দিয়ে এক সাগরের পানি অন্য সাগরে যায়। কিন্তু যখনই এক সমুদ্র থেকে পানি অন্য সমুদ্রে প্রবেশ করে তখন সে সমুদ্রটি তার স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য হারিয়ে ফেলে এবং অন্য সমুদ্রের পানির বৈশিষ্ট্যের সাথে একাকার হয়ে যায়। এভাবে দুই ধরনের পানির মধ্যে পরিবর্তন সাপেক্ষে একীভূতকারী বন্ধন হিসেবে এ অন্তরায় কাজ করে। স্বনামধন্য সমুদ্রবিজ্ঞানী এবং যুক্তরাষ্ট্রের কলোরাডো বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূ-তত্ত্ব বিভাগের অধ্যাপক ড. উইলিয়াম হে, কুরআনে উল্লেখিত এ বৈজ্ঞানিক ধারণাটি সমর্থনের সাথে সাথে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করেছেন।

কুরআনের সূরা নামল এর ৬১তম আয়াতেও এ বিষয়ের উল্লেখ রয়েছে, বলা হয়েছে। وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا

অর্থ ঃ তিনি দুই সমুদ্রের মাঝখানে অন্তরায় রেখেছেন।

ভূ-মধ্যসাগর এবং আটলান্টিক মহাসাগরের মিলনস্থল জিব্রাল্টারসহ আরও অনেক জায়গায় এ অন্তরায় লক্ষণীয়।

কিন্তু কুরআন যখন স্বাদ পানি ও লবণাক্ত পানির মধ্যে বিভক্তকারী অন্তরায় সম্পর্কে বলে তখন ঐ অন্তরায়ের সাথে নিষেধকারী প্রতিবন্ধকতার কথাই বলে।

আল্লাহ সূরা ফুরকান-এর ৫৩তম আয়াতে ঘোষণা করেছেন–

وَهُوَ الَّذِىْ مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ هٰذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ وَّهٰذَا مِلْحٌ اُجَاجٌ . وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخًا وَّحِجْرًا مَّحْجُوْرًا .

অর্থ ঃ তিনিই সমান্তরাল দুই সমুদ্র প্রবাহিত করেছেন, একটি সুপেয় এবং অপরটি নিবারক, লোনা ও বিস্বাদ; উভয়ের মাঝখানে রেখেছেন একটি অন্তরায়; একটি দুর্ভেদ্য আড়াল।

বর্তমানে আধুনিক বিজ্ঞান আবিষ্কার করেছে যে, নদীর মোহনায় যেখানে স্বাদ পানি ও লবণাক্ত পানি মিলিত হয়, সেখানকার অবস্থা ঐ স্থান থেকে ভিন্ন, যেখানে দুটি লবণাক্ত ধারা গিয়ে মিশে যায়। নদীর মোহনায় লবণাক্ত ও মিষ্টি পানি মিলিত হলে যে পার্থক্য সৃষ্টি হয়, তার কারণ হলো সেখানে দুটি স্তরকে পৃথককারী চিহ্নিত ঘনত্বের বিভাজনস্থল রয়েছে। এ বিভাজনস্থলে এক প্রকার লবণাক্ততা রয়েছে যা মিঠা ও লবণাক্ত উভয় থেকেই ভিন্ন। মিসরের নীলনদের যে স্থান ভূ-মধ্যসাগরে গিয়ে মিশেছে সে স্থানসহ আরও কয়েক জায়গায় এ ধরনের বিভাজনের দৃশ্য দেখা যায়।

সমুদ্রের গভীরে গাঢ় অন্ধকার

জেদ্দার বাদশাহ আব্দুল আযীয বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপক হিসেবে নিযুক্ত ছিলেন প্রখ্যাত সামুদ্রিক বিশেষজ্ঞ ও ভূ-তত্ত্ববিদ প্রফেসর দুর্গা রাও। তাকে সূরা নূর এর ৪০তম আয়াতের ওপর মন্তব্য করতে বলা হয়েছিল। আয়াতটি হলো–

اَوْ كَظُلُمٰتٍ فِىْ بَحْرٍ لُّجِّىٍّ يَّغْشٰىهُ مَوْجٌ مِّنْ فَوْقِهٖ مَوْجٌ مِّنْ فَوْقِهٖ سَحَابٌ . ظُلُمٰتٌۢ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ . اِذَآ اَخْرَجَ يَدَهٗ لَمْ يَكَدْ يَرٰىهَا . وَمَنْ لَّمْ يَجْعَلِ اللّٰهُ لَهٗ نُوْرًا فَمَا لَهٗ مِنْ نُّوْرٍ .

অর্থ ঃ অথবা (তাদের কর্ম) প্রমত্ত সমুদ্রের বুকে গভীর অন্ধকারের মতো যাকে উদ্বেলিত করে তরঙ্গের ওপর তরঙ্গ, যার উপরে ঘনকালো মেঘমালা আছে। একের ওপর এক অন্ধকার। যখন সে তার হাত বের করে, তখন সে তাকে

একেবারেই দেখতে পায় না। আল্লাহ যাকে আলো দেন না তার কোনো আলো নেই।

এ আয়াত সম্পর্কে অধ্যাপক রাও মন্তব্য করতে গিয়ে বলেছেন– বিজ্ঞানীরা সম্প্রতি আধুনিক যন্ত্রপাতির সাহায্যে সমুদ্রের গভীরের অন্ধকার সম্পর্কে নিশ্চিত হতে পেরেছেন যে, মানুষ কোনো কিছুর সাহায্য ছাড়া ২০-৩০ মিটারের অধিক পানির নিচে ডুব দিতে পারে না এবং মহাসাগরীয় অঞ্চলসমূহে ২০০ মিটারের অধিক পানির নিচে বাঁচতে পারে না। এ আয়াতটি সকল সমুদ্র নির্দেশ করে না। কারণ, সকল সমুদ্রের নিচে অন্ধকারের স্তর নেই। আয়াতে শুধু গভীর সমুদ্র সম্পর্কে বলা হয়েছে। যেমন– 'এক বিশাল গভীর সমুদ্রের অন্ধকার।' আর দুটি কারণে গভীর মহাসাগরে স্তরযুক্ত অন্ধকার দেখা যায়। এগুলো হলো–

ক.সাতটি রং মিশেয়ে রংধনু গঠিত। এ সাতটি রং হলো– বেগুনি, নীল, আসমানি, সবুজ, হলুদ, কমলা ও লাল। আলোক রশ্মি পানিতে পড়লে তা শোষিত হয় বা ভেঙ্গে যায়। পানির উপরিভাগের ১০ মিটার থেকে ২৫ মিটার পর্যন্ত পানি লাল রং শোষণ করে। এজন্য কোন ডুবুরি পানির ২৫ মিটার নিচে আহত হলে সে তার রক্তের লাল রং দেখতে পাবে না। কেননা ঐ গভীরতায় লাল রং পৌছে না। এভাবে ৩০ মিটার থেকে ৫০ মিটারের মধ্যে কমলা রং, ৫০ থেকে ১০০ মিটারের মধ্যে হলুদ রং, ১০০ থেকে ২০০ মিটারের মধ্যে সবুজ রং এবং সর্বশেষে নীল, আসমানি ও বেগুনি রং ২০০ মিটারের অধিক দূরত্ব অতিক্রমের পর শোষিত হয়। বিভিন্ন স্তরে রংগুলোর এভাবে ক্রমাগত অদৃশ্য হওয়ার পরে সমুদ্র অন্ধকারে নিমজ্জিত হয় অর্থাৎ আলোর স্তর পরিণত হয় অন্ধকারে। এজন্য পানির ১০০০ মিটার নিচে সম্পূর্ণ অন্ধকার।

খ. মেঘমালা সূর্য রশ্মিকে ধারণ করে গতিপথ বিচ্ছিন্ন করে দেয়। ফলে মেঘের নিচে অন্ধকারের একটি আস্তরণ তৈরি হয়। এটাই অন্ধকারের প্রথম স্তর। সূর্যের আলো সমুদ্রের উপরিভাগে পতিত হলে তা পৃষ্ঠভাগের ঢেউয়ের মধ্যে প্রতিফলিত হয়ে এটিকে উজ্জ্বল করে। সেহেতু ঢেউগুলোই আলোকে প্রতিফলিত করে এবং অন্ধকারের সৃষ্টি করে। তাই সমুদ্রের দুটি অংশ বিদ্যমান । উপরের অংশে রয়েছে আলো এবং উষ্ণতা আর গভীর অংশে রয়েছে অন্ধকার। ঢেউয়ের কারণে উপরের অংশটি গভীর সমুদ্র থেকে ভিন্ন ধরনের। অভ্যন্তরীণ ঢেউয়ের মধ্যে সাগর ও মহাসাগরের গভীর জলরাশিও অন্তর্ভুক্ত আছে। কারণ, তখন উপরের পানি অপেক্ষা নিচের পানির ঘনত্ব থাকে বেশি। অভ্যন্তরীণ ঢেউয়ের নিচে অন্ধকার শুরু হয়।

এমনকি সমুদ্রের নিচে মাছও দেখতে পায় না। তাদের আলোর একমাত্র উৎস হলো নিজেদের শরীর থেকে বিকিরিত আলো।

কুরআনের সূরা আন নূর-এর ৪০তম আয়াতে এ বিষয়টি যথার্থভাবে বর্ণনা করা হয়েছে–

أَوْ كَظُلُمَاتٍ فِي بَحْرٍ لُّجِّيٍّ يَغْشَاهُ مَوْجٌ مِّن فَوْقِهِ مَوْجٌ

অর্থ ঃ 'অথবা (তাদের কর্ম) প্রমত্ত সমুদ্রের বুকে গভীর অন্ধকারের ন্যায়, যাকে উদ্বেলিত করে তরঙ্গের ওপর তরঙ্গ।

ভিন্নভাবে বলা যায়, এ সব ঢেউয়ের ওপর আরও বিভিন্ন প্রকারের ঢেউ আছে যা মহাসাগরের উপরিভাগে দেখতে পাওয়া যায়। কুরআনের সূরা নূর-এর ৪০তম আয়াতে বলা হয়েছে– "مِّن فَوْقِهِ سَحَابٌ ظُلُمَاتٌ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ" অর্থঃ 'যার উপরে ঘন কালো মেঘ আছে। একের ওপর এক ঘন অন্ধকার।'

মেঘমালা একের ওপর এক প্রতিবন্ধক যা পরবর্তীতে বিভিন্ন স্তরে রঙের শোষণের মাধ্যমে নিশ্ছিদ্র অন্ধকারের সৃষ্টি করে।

অধ্যাপক দুর্গা রাও উপসংহারে এই বলে সমাপ্ত করেন যে, '১৪০০ বছর আগে একজন সাধারণ মানুষের দ্বারা এ বিষয়টি এমন বিস্তারিত বিশ্লেষণ করা সম্ভব ছিল না। সুতরাং এসব তথ্য সন্দেহাতীতভাবে কোনো অলৌকিক উৎস থেকে এসেছে।'

জীববিজ্ঞান

(Biology)

প্রতিটি জীব পানি থেকে সৃষ্ট

বিজ্ঞানের অগ্রযাত্রার পরেই কেবল আমরা জানতে পেরেছি যে, জীবকোষের মৌলিক উপাদান সাইটোপ্লাজম ৮০ ভাগ পানি দিয়ে গঠিত। আধুনিক গবেষণা আরও প্রকাশ করেছে যে, অধিকাংশ জীবের শরীরেই শতকরা ৫০ ভাগ হতে শতকরা ৯০ ভাগ পানি আছে এবং প্রতিটি জীবন্ত সত্তারই অস্তিত্ব রক্ষার জন্য পানি অপরিহার্য।

প্রত্যেক প্রাণীকে যে সৃষ্টি করা হয়েছে পানি থেকে, ১৪ শতাব্দি পূর্বে কোনো মানুষের পক্ষে কি তা অনুমান করা সম্ভব ছিল? তদুপরি আরবের মরুভূমির কোলে

মানুষের দ্বারা এ ধরনের বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্ত কি কল্পনাযোগ্য হতো, যেখানে সর্বদা বিরাজমান ছিল পানির দুষ্প্রাপ্যতা?

পবিত্র কুরআনের সূরা আম্বিয়ার ৩০তম আয়াতে বলা হয়েছে—

أَوَلَمْ يَرَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ ـ

অর্থ ঃ কাফিররা কি দেখে না যে, আসমান ও যমিনের মুখ বন্ধ ছিল, অতঃপর আমি উভয়কে খুলে দিলাম এবং প্রাণবন্ত সবকিছু পানি থেকে সৃষ্টি করলাম। তবুও কি তারা ঈমান আনবে না?

অনুরূপভাবে সূরা নূর-এর ৪৫তম আয়াতটি পানি দ্বারা প্রাণীর সৃষ্টি সম্পর্কে বর্ণনা করা হয়েছে– وَاللَّهُ خَلَقَ كُلَّ دَابَّةٍ مِّن مَّاءٍ

অর্থ ঃ আল্লাহ প্রত্যেক প্রাণীকে সৃষ্টি করেছেন পানি দ্বারা।

সূরা ফুরকান-এর ৫৪তম আয়াতটিও মানুষ সৃষ্টি সম্পর্কে বলা হয়েছে–

وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا ـ

অর্থ ঃ তিনিই মানুষকে পানি থেকে সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর তাকে বংশ ও বৈবাহিক সম্পর্কশীল করেছেন। তোমার প্রতিপালক সবকিছুই করতে সক্ষম।

উদ্ভিদবিজ্ঞান
(Botany)

উদ্ভিদ জোড়ায় জোড়ায় সৃষ্টি হয়

আগে মানুষ জানত না যে, উদ্ভিদের মধ্যেও পুরুষ ও স্ত্রীলিঙ্গের পার্থক্য রয়েছে। উদ্ভিদবিজ্ঞান বলে, প্রত্যেক উদ্ভিদের পুরুষ ও স্ত্রীলিঙ্গ আছে। এমনকি উভলিঙ্গ বিশিষ্ট গাছেরও পুরুষ ও স্ত্রী লিঙ্গ আছে।

কুরআনে সূরা ত্বহা'র ৫৩তম আয়াতে আল্লাহ বলেছেন–

وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّن نَّبَاتٍ شَتَّىٰ ـ

অর্থ ঃ তিনি আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করেন, আর তা দিয়ে আমি বিভিন্ন প্রকারের উদ্ভিদ জোড়ায় জোড়ায় উৎপন্ন করি।

ফলের মধ্যে আছে পুরুষ ও স্ত্রীলিঙ্গ

পবিত্র কুরআনের সূরা রাদ-এর ৩য় আয়াতে বলা হয়েছে–

وَمِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ جَعَلَ فِيهَا زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ ـ

অর্থ ঃ আর প্রত্যেক ফলের মধ্যে তিনি দু'প্রকার বা জোড়া সৃষ্টি করেছেন।

ফল হলো গাছের উৎপাদিত ফসল । ফল উৎপন্ন হওয়ার পূর্বের স্তর হলো ফুল। ফুলের আছে পুরুষ অঙ্গ (পুংকেশর) এবং স্ত্রী অঙ্গ (স্ত্রীকেশর)। পরাগরেণু বাহিত হয়ে ফুলে এসে পড়লে তাতে ফল ধরে। পর্যায়ক্রমে ফল পাকে এবং তার বীজ মুক্ত করে। সুতরাং সকল ফলই পুরুষ ও স্ত্রী অঙ্গের অস্তিত্ব সূচিত করে। আল কুরআনে এ সত্যই বর্ণিত হয়েছে।

বিশেষ কিছু প্রজাতি রয়েছে যেগুলোর ফল অনিষিক্ত ফুল থেকে আসে। এগুলোকে বলা হয় পার্থেনোকার্পিক ফল। যেমন ঃ কলা, আনারস, ডুমুর, কমলা, আঙ্গুর ইত্যাদি। এগুলোরও সুনির্দিষ্ট লিঙ্গ বৈশিষ্ট্য রয়েছে ।

জোড়ায় জোড়ায় সবকিছুর সৃষ্টি

কুরআনে সূরা যারিয়াত এর ৪৯ নং আয়াতে আল্লাহ বলেছেন–

وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ ـ

অর্থ ঃ আর আমি প্রত্যেক জিনিসকে জোড়ায় জোড়ায় সৃষ্টি করেছি।

এ আয়াতটিতে সকল কিছুকে জোড়ায় জোড়ায় সৃষ্টির কথা বলা হয়েছে। মানুষ ছাড়াও প্রাণী, গাছপালা, ফল-ফলাদিতে এ জোড়া লক্ষণীয়। বিদ্যুতে যেমন আছে ধনাত্মক ও ঋণাত্মক চার্জ, সেরকম প্রতিটি বস্তুর পরমাণুতে ঋণাত্মক (Negative) চার্জবাহী ইলেক্ট্রন ও ধনাত্মক (Positive) চার্জবাহী প্রোটন আছে।

সূরা ইয়াসিন-এর ৩৬তম আয়াতে উল্লেখ আছে।

سُبْحَانَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ ـ

অর্থ ঃ পূত পবিত্র সেই সত্তা যিনি জমিন থেকে উৎপন্ন উদ্ভিদকে, মানুষকে এবং যা তারা জানে না তার প্রত্যেককে জোড়ায় জোড়ায় সৃষ্টি করেছেন।

এখানে কুরআন বলেছে, বর্তমানে মানুষ যা জানে না এবং পরবর্তী সময়ে যা আবিষ্কৃত হতে পারে সেগুলোসহ সবকিছু সৃষ্টি করা হয়েছে জোড়ায় জোড়ায় ।

প্রাণিবিজ্ঞান
(Zoology)

প্রাণী ও পাখিরা দলবদ্ধ হয়ে বাস করে

পবিত্র কুরআনের সূরা আনআম এর ৩৮তম আয়াতে বলা হয়েছে–

وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَالُكُمْ مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ ثُمَّ إِلَى رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ ـ

অর্থ ঃ আর যত প্রকার প্রাণী পৃথিবীতে বিচরণশীল রয়েছে এবং যত প্রকার পাখি দুই ডানাযোগে উড়ে বেড়ায়, তারা সবাই তোমাদের মতোই একেকটি সম্প্রদায় বা দল।

গবেষণায় প্রমাণিত হয়েছে যে, প্রাণী ও পাখিরা দল বা সম্প্রদায় হিসেবে বাস করে। তারা একত্রে বসবাস ও কাজ করে এবং সুসংগঠিত থাকে।

পাখির উড্ডয়ন

পাখির উড্ডয়ন সম্পর্কে পবিত্র কুরআনের সূরা নাহল-এর ৭৯তম আয়াতে উল্লেখ আছে–

أَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ مُسَخَّرَاتٍ فِي جَوِّ السَّمَاءِ ـ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا اللَّهُ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ـ

অর্থ ঃ তারা কি উড়ন্ত পাখি অবলোকন করে না? এগুলো আকাশের বুকে আজ্ঞাধীন রয়েছে। আল্লাহ ছাড়া কেউ এগুলোকে আগলে রাখে না। নিশ্চয়ই এতে রয়েছে বিশ্বাসীদের জন্য নিদর্শনাবলি।

সূরা মূলক-এর ১৯-২০ তম আয়াতে বলা হয়েছে–

أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صَافَّاتٍ وَيَقْبِضْنَ ـ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا الرَّحْمَٰنُ ـ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ بَصِيرٌ ـ

অর্থঃ তারা কি লক্ষ্য করে না, তাদের মাথার ওপর পাখা বিস্তারকারী ও পাখা সংকোচনকারী উড়ন্ত পাখিকুলের প্রতি? মেহেরবান আল্লাহই তাদেরকে স্থির রাখেন। তিনি সর্ববিষয়ে লক্ষ্য রাখেন।

আয়াতগুলো এ ধারণা প্রকাশ করে যে, আল্লাহ নিজ ক্ষমতায় পাখিকে আকাশে ধরে রাখেন। এ আয়াতগুলো আল্লাহর নিয়ম অনুসারে পাখির আচরণের চূড়ান্ত নির্ভরতার ওপর জোর দেয়। আধুনিক বৈজ্ঞানিক তথ্যাদি থেকে জানা যায়, নির্দিষ্ট প্রজাতির এমন সব পাখি রয়েছে, যাদের চলাচলে পূর্বনির্ধারিত পরিচয় বর্তমান পাখির জেনেটিক কোড অনুযায়ী বংশগতির তথ্য। উপাত্ত জীবকোষ বা ক্রমোজম-এ রক্ষিত থাকে। এ রক্ষিত গমনাগমন সম্পর্কিত কর্মসূচির কারণেই এ ধরনের পাখির বাচ্চারা পর্যন্ত দীর্ঘ ও দুর্গম যাত্রাপথের নির্দিষ্ট ভ্রমণে সফরে যেতে সক্ষম, যাদের ইতোপূর্বে দেশান্তরে গমনাগমনের কোন প্রকার অভিজ্ঞতা নেই। এমনকি কোনো পথ নির্দেশনাও নেই। এরা নির্দিষ্ট তারিখের মধ্যে নির্দিষ্ট স্থানে যেতে এবং স্ব-স্থানে ফিরে আসতেও সক্ষম।

প্রফেসর হামবার্গার তাঁর 'পাওয়ার এ্যাণ্ড ফ্র্যাগিলিটি' নামক গ্রন্থে প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে বসবাসকারী 'মালটন্ বার্ড' নামক এক প্রকার বিশেষ পাখির উদাহরণ দিয়েছেন। এ পাখিরা ইংরেজি সংখ্যা 8 (আট) এর আকৃতিতে ১৫,০০০ কিলোমিটারের অধিক দূরত্ব অতিক্রম করে এবং ৬ মাসের বেশি সময় নিয়ে এরা গন্তব্যে পৌঁছে। যাত্রা স্থানে ফিরে আসতে বড়জোড় এক সপ্তাহ লাগে। এরূপ একটি ভ্রমণের জন্য পাখিদের স্নায়ুকোষে খুবই জটিল নির্দেশিকা বিদ্যমান রয়েছে। এ জটিল সফর ও প্রত্যাবর্তনের প্রোগ্রাম নিশ্চিতভাবে নির্দিষ্ট ও সুনির্ধারিত। সেই সুনির্ধারিত কর্মসূচি প্রণেতার স্বরূপ বা পরিচয় জানার জন্য আমাদের চেষ্টা করা উচিত।

শ্রমিক মৌমাছি

পবিত্র কুরআনের সূরা নাহল এর ৬৮-৬৯তম আয়াতে উল্লেখ আছে,

وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ ـ ثُمَّ كُلِي مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلًا ـ

অর্থ ঃ আর তোমার প্রতিপালক মৌমাছিকে নির্দেশ দিলেন, পাহাড়ের গায়ে, গাছে এবং উঁচু চালে ঘর তৈরি কর। অতঃপর প্রত্যেক ফল থেকে আহার কর, অতঃপর অনুসরণ কর তোমার প্রতিপালকের (শিখানো) সহজ পদ্ধতি।

মৌমাছির আচরণ ও যোগাযোগের বিষয়ে গবেষণার জন্য ১৯৭৩ সালে ভন-ফ্রিচ পৃথিবীর সবচেয়ে মর্যাদার অধিকারী নোবেল পুরস্কার অর্জন করেন। কোনো নতুন বাগান বা ফুলের সন্ধান পাওয়ার পর একটি মৌমাছি আবার মৌচাকে ফিরে যায়

এবং 'মৌমাছি নৃত্য' নামক আচরণের মাধ্যমে এটির সহকর্মী মৌমাছিদের সেখানে যাওয়ার সঠিক গতিপথ তথা মানচিত্র বলে দেয়। অন্যান্য শ্রমিক মৌমাছিকে তথ্য দেয়ার উদ্দেশ্যে এ ধরনের আচরণ ভিডিও ও অন্যান্য পদ্ধতির সাহায্যে বৈজ্ঞানিকভাবে প্রমাণিত হয়েছে। কুরআন উপরের আয়াতে উল্লেখ করেছে মৌমাছি কীভাবে তার পালনকর্তার প্রশস্ত পথের সন্ধান পায়।

সূরা নাহলের উপরোক্ত ৬৮ - ৬৯ নং আয়াতে উল্লিখিত ক্রিয়াপদে স্ত্রীলিঙ্গ ব্যবহৃত হয়েছে كُلِي (খাও) এবং فَاسْلُكِي (চল)। এর দ্বারা ইঙ্গিত পাওয়া যায় খাদ্যের অন্বেষণে বাসা ত্যাগকারী মৌমাছি হচ্ছে স্ত্রী মৌমাছি। অন্য কথায়, সৈনিক কিংবা শ্রমিক মৌমাছি হচ্ছে স্ত্রী জাতীয় মৌমাছি।

শেক্সপিয়রের 'হেনরী দি ফোর্থ' নাটকের কিছু সংলাপে মৌমাছি সম্পর্কে উল্লেখ করা হয়েছে যে, মৌমাছিরা হচ্ছে সৈনিক এবং তাদের একটি রাজা রয়েছে। শেক্সপিয়রের যুগে লোকজনের মৌমাছি সম্পর্কে এ ধরনের ধারণাই ছিল। তারা ভাবতো, কর্মী মৌমাছিরা পুরুষ এবং ঘরে ফিরে তাদেরকে একটি রাজা মৌমাছির কাছে জবাবদিহি করতে হয়। যা হোক, এটা মোটেও সত্য নয়। শ্রমিক মৌমাছিরা হল স্ত্রী এবং তারা রাজা মৌমাছির কাছে নয় বরং রাণী মৌমাছির কাছে জবাবদিহি করে। কিন্তু এ বিষয়টি ৩০০ বছর পূর্বে আধুনিক অনুসন্ধানে আবিষ্কৃত হয়েছে। আর পবিত্র কুরআন তা বলে দিয়েছে ১৪০০ বছর পূর্বে।

মাকড়সার জাল

কুরআনের সূরা আনকাবুতের ৪১ নং আয়াতে বলেছে—

مَثَلُ الَّذِيْنَ اتَّخَذُوا مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ اَوْلِيَاءَ كَمَثَلِ الْعَنْكَبُوْتِ . اِتَّخَذَتْ بَيْتًا وَاِنَّ اَوْهَنَ الْبُيُوْتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوْتِ . لَوْ كَانُوْا يَعْلَمُوْنَ .

অর্থ ঃ যারা আল্লাহকে বাদ দিয়ে অপরকে সাহায্যকারীরূপে গ্রহণ করে, তাদের উপমা মাকড়সার মত, যে নিজের জন্য একটি ঘর বানায়। নিশ্চয়ই সব ঘরের চেয়ে মাকড়সার ঘরই অধিক দুর্বল, যদি তারা জানতো।

হালকা-পাতলা, সূক্ষ্ম, দুর্বল-ক্ষণভঙ্গুর হিসেবে মাকড়সার জালের বাহ্যিক গঠনের বর্ণনা দেয়া ছাড়াও কুরআন মাকড়সার ঘরে হৃদ্যতার অসারতার উপরেও জোর দিয়েছে। মাকড়সার ঘরেই স্ত্রী মাকড়সা তার সহকর্মী পুরুষ মাকড়সাকে হত্যা করে।

পিঁপড়ার জীবনধারা

কুরআনের সূরা আন-নামলের ১৭ ও ১৮ আয়াতে বলা হয়েছে -

وَحُشِرَ لِسُلَيْمٰنَ جُنُوْدُهٗ مِنَ الْجِنِّ وَالْاِنْسِ وَالطَّيْرِ فَهُمْ يُوْزَعُوْنَ . حَتّٰى اِذَا اَتَوْا عَلٰى وَادِ النَّمْلِ قَالَتْ نَمْلَةٌ يّٰاَيُّهَا النَّمْلُ ادْخُلُوْا مَسٰكِنَكُمْ لَا يَحْطِمَنَّكُمْ سُلَيْمٰنُ وَجُنُوْدُهٗ . وَهُمْ لَا يَشْعُرُوْنَ .

অর্থ : সুলাইমানের সামনে তার সেনাবাহিনীকে সমবেত করা হয়েছিল। জ্বিন, মানুষ ও পাখিদের থেকে। আর তাদের কুচকাওয়াজ করানো হলো। তারপর যখন তারা পিপীলিকা অধ্যুষিত উপত্যকায় পৌছল, তখন এক পিপীলিকা বলল, হে পিপীলিকার দল, তোমরা তোমাদের ঘরে প্রবেশ কর। অন্যথায় সুলাইমান ও তার বাহিনী অজ্ঞাতসারে তোমাদেরকে পিষে ফেলবে।

কেউ হয়তো অতীতে এই বলে কুরআনের প্রতি উপহাস করে থাকতে পারে যে, কুরআন যাদুকরী বা রূপকথার কাহিনীর বই, যাতে পিঁপড়ার পরস্পরের কথা এবং উন্নত বার্তা বিনিময়ের বিষয়ে উল্লেখ আছে। সাম্প্রতিক গবেষণায় পিঁপড়ার জীবনধারা সম্পর্কে কিছু বাস্তবতা জানা গেছে, যেগুলো মানুষের পূর্বে জানা ছিল না। গবেষণায় বলা হয়েছে, মানুষের জীবন ধারার সাথে যে সকল প্রাণী ও কীটপতঙ্গের অধিকতর সাদৃশ্য রয়েছে, তা হলো পিঁপড়া। পিঁপড়া সম্পর্কে নিচের তথ্যগুলো থেকে বিষয়টির সত্যতা যাচাই করা সম্ভব।

১. মানুষের ন্যায় পিঁপড়ারা তাদের মৃতদেহকে কবরস্থ করে।

২. পিঁপড়াদের মধ্যে উন্নত পর্যায়ের শ্রম বিভাগ বিদ্যমান। তাদের মধ্যে সত্যিকার অর্থে ব্যবস্থাপক, তত্ত্বাবধায়ক, সর্দার, সৈনিক শ্রমিক ইত্যাদি রয়েছে।

৩. মাঝে মাঝে তারা গল্পসল্প করতে একত্রিত হয়।

৪. নিজেদের মধ্যে যোগাযোগ রক্ষা করার জন্য তাদের রয়েছে উন্নত যোগাযোগ পদ্ধতি।

৫. দ্রব্য বিনিময়ের জন্য তারা নিয়মিত বাজার বসায়।

৬. শীতকালে দীর্ঘ সময়ের জন্য তারা খাদ্যশস্য সঞ্চিত করে রাখে এবং খাদ্যশস্য যদি অঙ্কুরিত হয়, তাহলে তারা এর শিকড় কেটে দেয়; সম্ভবত তারা এটা বুঝতে পারে যে, খাদ্যশস্যকে অঙ্কুরিত অবস্থায় রেখে দিলে তা পচে যাবে। যদি তাদের

মজুদকৃত শস্যদানা বৃষ্টিতে ভিজে যায়, তাহলে এগুলোকে রৌদ্রে শুকাতে বাইরে নিয়ে যায় এবং শুকানোর পর আবার ভেতরে নিয়ে আসে। মনে হয় তারা এটাও জানে যে, আর্দ্রতার কারণে শস্যদানায় মুকুল বের হতে পারে। কিংবা শস্যদানায় পঁচন লাগতে পারে।

ঔষধবিজ্ঞান

(Medicine Science)

মধু মানুষের জন্য শেফা

নানা ধরনের ফুল এবং ফলের রস মৌমাছিরা শোষণ করে এবং নিজের শরীরে মধু তৈরির পর তা মোম কোষে জমা করে। মাত্র কয়েক শতাব্দী পূর্বে মানুষ জানতে পারে যে মধু মৌমাছির পেটে তৈরি হয়। অথচ বাস্তব সত্যটি ১৪০০ বছর আগে পবিত্র কুরআনের সূরা নাহল এর ৬৯তম আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে–

ثُمَّ كُلِىْ مِنْ كُلِّ الثَّمَرٰتِ فَاسْلُكِى سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلًا ـ

'অতঃপর প্রত্যেক ফল থেকে আহার কর, এরপর তোমার প্রতিপালকের সহজ পদ্ধতি অনুসরণ কর।'

يَخْرُجُ مِنْ بُطُوْنِهَا شَرَابٌ مُّخْتَلِفٌ اَلْوَانُهٗ فِيْهِ شِفَاءٌ لِّلنَّاسِ ـ

অর্থঃ তাদের পেট থেকে বেরিয়ে আসে একটি পানীয়– বিচিত্র যার বর্ণ, যাতে রয়েছে মানুষের জন্য রোগমুক্তি।

আমরা জানি মধুর ভেতর রোগ নিরাময়ের গুণ বিদ্যমান এবং এটা লঘু জীবাণুনাশক। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে রাশিয়ানরা তাদের ক্ষত শুকানোর জন্য মধু ব্যবহার করতো। ক্ষতস্থানে আর্দ্রতা থাকলে ক্ষত স্থান কিছুটা নিরাময় হয়। মধুর ঘনত্বের কারণে ক্ষতস্থানে কোন ছত্রাক বা ব্যাকটেরিয়া জন্মাতে পারে না। যদি কোনো ব্যক্তি কোনো গাছের ফলের এলার্জি রোগে ভোগে, তাহলে তাকে ঐ গাছ থেকে আহরিত মধু পান করালে তার এলার্জি প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ে। মধুতে রয়েছে ফল শর্করা বা ফ্রুকটোজ এবং ভিটামিন-কে।

বিজ্ঞানীরা মধুর উৎস ও গুণাগুণ সম্পর্কে কুরআনে বর্ণিত জ্ঞান আবিষ্কার করেছেন কোরআন নাযিলের কয়েক শতাব্দী পরে।

শারীরতত্ত্ব

(Physiology)

রক্ত সঞ্চালন

বিশ্ববিখ্যাত মুসলিম বিজ্ঞানী ইবনে নাফীসের ৬০০ বছর পূর্বে এবং পশ্চিমা বিশ্বে উইলিয়াম হার্ভে কর্তৃক রক্ত চলাচলের ধারণা প্রদানের ১০০০ বছর পূর্বে কুরআন অবতীর্ণ হয়েছিল। প্রায় ১৩০০ বছর পূর্বে এটা জ্ঞাত ছিল যে, অন্ত্রে কী ঘটে এবং কীভাবে বিপাকীয় প্রক্রিয়ায় খাদ্যের বিভিন্ন উপাদান শোষিত হয়ে দেহের বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের পুষ্টি সাধন করে। কুরআনের একটি আয়াত দুধের উপাদানের উৎস সম্পর্কে বর্ণনা করে, যা এ মতবাদগুলোর সাথে পুরোপুরি সামঞ্জস্যপূর্ণ।

তবে এ সম্পর্কিত কুরআনের আয়াত অনুধাবন করতে হলে এটা জানা অপরিহার্য যে, অন্ত্রনালীতে কী কী রাসায়নিক প্রক্রিয়া ঘটে এবং সেখান থেকে অর্থাৎ খাদ্যের নির্যাস কী করে একটি জটিল প্রক্রিয়ায় রক্তে প্রবাহিত হয়। কখনো কখনো তা রাসায়নিক বৈশিষ্ট্যের ওপর নির্ভর করে যকৃতের মাধ্যমে রক্তে প্রবাহিত হয়। রক্ত সেগুলোকে শরীরের সবগুলো অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে সরবরাহ করে, যার মধ্যে দুধ উৎপাদনকারী লালাগ্রন্থিও অন্তর্ভুক্ত। সহজ করে বললে, অন্ত্রনালীর কিছু বিশেষ ধরনের নির্যাস অন্ত্রের আবরণের মধ্য দিয়ে বেরিয়ে আসে এবং এ নির্যাসগুলো রক্তসঞ্চালনের মাধ্যমে বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে পৌঁছায়। কুরআনের সূরা নাহল-এর ৬৬তম আয়াতটির মর্মার্থ অনুধাবন করলে উল্লিখিত ধারণাটির যথার্থ মূল্যায়ন সহজ হবে। এখানে বলা হয়েছে–

اِنَّ لَكُمْ فِى الْاَنْعَامِ لَعِبْرَةً ـ نُسْقِيْكُمْ مِّمَّا فِىْ بُطُوْنِهٖ مِنْ بَيْنِ فَرْثٍ وَّدَمٍ لَّبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِّلشّٰرِبِيْنَ ـ

অর্থ ঃ আর নিশ্চয়ই তোমাদের জন্য চতুষ্পদ জন্তুসমূহের মধ্যে চিন্তা করার বিষয় রয়েছে। আমি তোমাদেরকে পান করাই তাদের উদরস্থ বস্তুসমূহের মধ্য থেকে গোবর ও রক্ত থেকে নিঃসৃত দুধ যা পানকারীদের জন্য উপকারী।

সূরা মু'মিনুন এর ২১তম আয়াতে বলা হয়েছে–

وَاِنَّ لَكُمْ فِى الْاَنْعَامِ لَعِبْرَةً ـ نُسْقِيْكُمْ مِّمَّا فِىْ بُطُوْنِهَا وَلَكُمْ فِيْهَا مَنَافِعُ كَثِيْرَةٌ وَّمِنْهَا تَاْكُلُوْنَ ـ

অর্থ ঃ আর নিশ্চয়ই তোমাদের জন্য চতুষ্পদ জন্তুসমূহের মধ্যে চিন্তা করার বিষয় রয়েছে। আমি তোমাদেরকে তাদের পেটে যা আছে (দুধ) তা থেকে পান করাই। আর তাতে তোমাদের জন্য রয়েছে বহুবিধ উপকার। যা থেকে তোমরা খাও।

পশুর দুগ্ধ উৎপাদন সম্পর্কে কুরআনের কথা আর আধুনিক শারীরবিদ্যা যা আবিষ্কার করেছে তা বিস্ময়করভাবে মিলে যায়।

ভ্রূণতত্ত্ব
(Embryology)
মানুষ আলাক হতে সৃষ্টি

একদল আরব পণ্ডিত কয়েক বছর আগে কুরআন হতে ভ্রূণ বিজ্ঞানের তথ্য সংগ্রহ করেছিলেন। সেক্ষেত্রে তারা কুরআনের উপদেশকে দৃষ্টান্ত হিসেবে সামনে রাখেন সূরা আম্বিয়ার ৭ম আয়াতে উল্লেখ আছে–

فَسْـَٔلُوٓا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ـ

অর্থ : অতএব জ্ঞানীদেরকে জিজ্ঞেস কর, যদি তোমাদের জানা না থাকে।

কুরআন থেকে ভ্রূণসংক্রান্ত সকল তথ্য একত্রিত করে ইংরেজীতে অনুবাদ করার পর কানাডার টরেন্টো বিশ্ববিদ্যালয়ের ভ্রূণতত্ত্বের অধ্যাপক এবং এনাটমি বিভাগের চেয়ারম্যান প্রফেসর ড. কেইথ মূরের নিকট উপস্থাপন করা হয়। বর্তমানে তিনি ভ্রূণতত্ত্ববিদ্যার শ্রেষ্ঠ বিশেষজ্ঞদের অন্যতম।

ভ্রূণতত্ত্ব সম্পর্কে কুরআনে যেসব তথ্য প্রদান করা হয়েছে সেগুলো সম্পর্কে তার মতামত প্রদান করতে অনুরোধ জানানো হয়। তার নিকট উপস্থাপিত কুরআনের আয়াতের অনুবাদগুলো সতর্কতার সাথে যাচাই করার পর ড. মূর বলেন, ভ্রূণতত্ত্ব সম্পর্কে কুরআনের উল্লেখিত অধিকাংশ তথ্য ভ্রূণতত্ত্বের আধুনিক আবিষ্কারের সাথে পুরোপুরি মিলে যায় এবং কোনোক্রমেই এগুলোর মধ্যে পার্থক্য সূচিত হয় না। তিনি আরও বলেন যে কিছু আয়াত রয়েছে যার বৈজ্ঞানিক সত্যতা সম্পর্কে তিনি মন্তব্য করতে অপারগ। সেগুলো সত্য না মিথ্যা তাও তিনি বলতে পারেননি, কারণ ঐ আয়াতগুলোতে বর্ণিত তথ্যসমূহ সম্পর্কে তিনি নিজেই জ্ঞাত নন। আধুনিক ভ্রূণতত্ত্ব বিদ্যায় বা লেখালেখিতে সেগুলোর কোনো বর্ণনা পাওয়া যায় না। ঐ ধরনের একটি আয়াত হলো–

اِقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ ـ خَلَقَ الْإِنسَانَ مِنْ عَلَقٍ ـ

অর্থ : পাঠ করুন, আপনার পালনকর্তার নামে, যিনি সৃষ্টি করেছেন। সৃষ্টি করেছেন মানুষকে জমাট রক্ত থেকে। (সূরা আলাক্ব ঃ ১-২)

আরবি শব্দ আলাক (عَلَقٍ) এর অর্থ 'জমাট রক্ত'। এর অন্য অর্থ হলো– দৃঢ়ভাবে আটকে থাকে এমন আঠালো জিনিস। যেমন- জোঁক কামড় দিয়ে আটকে থাকে।

প্রফেসর কেইথ মূর-এর জানা ছিল না যে প্রাথমিক পর্যায়ে একটি ভ্রূণকে জোঁকের মতই দেখায়। একটি অত্যন্ত শক্তিশালী অণুবীক্ষণ যন্ত্রের মাধ্যমে তিনি ভ্রূণের প্রাথমিক অবস্থা যাচাই করার উদ্দেশ্যে গবেষণা শুরু করেন এবং প্রাথমিক অবস্থায় ভ্রূণের আকৃতির সাথে একটি জোঁকের আকৃতিকে তুলনা করেন। তিনি এ দুটির মধ্যে অদ্ভুত মিল দেখে অভিভূত হয়ে যান। একইভাবে কুরআন থেকে ভ্রূণতত্ত্ব সম্পর্কে অজ্ঞাত অনেক জ্ঞান তিনি লাভ করেন।

প্রফেসর কেইথ মূর কুরআন ও হাদিসে বর্ণিত জেনেটিকস সম্পর্কিত আশিটির মতো প্রশ্নের জবাব দেন। তিনি বলেন, ভ্রূণবিজ্ঞানের সর্বশেষ আবিষ্কারের সাথে এসব তথ্যের পূর্ণ মিল রয়েছে। প্রফেসর মূর বলেন, 'আমাকে যদি আজ থেকে তিরিশ (৩০) বছর পূর্বে এ সকল প্রশ্ন জিজ্ঞেস করা হতো, তাহলে বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের অভাবে আমি এগুলোর অর্ধেকেরও উত্তর দিতে পারতাম না।'

প্রফেসর কেইথ মূর ইতোপূর্বে 'The Developing Human' নামক একটি বই লিখেছিলেন। কুরআন থেকে নতুন জ্ঞান অর্জনের পর তিনি ১৯৮২ সালে বইটির তৃতীয় সংস্করণ লিখেন। বইটি একক লেখক রচিত সর্বোত্তম চিকিৎসা গ্রন্থ হিসেবে পুরস্কার লাভ করে। বইটি বিশ্বের বিখ্যাত অনেক ভাষায় অনূদিত হয়েছে এবং প্রথম বর্ষের মেডিকেল কলেজের ভ্রূণতত্ত্বের পাঠ্য বই হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

ডা. মূর ১৯৮১ সালে সৌদি আরবের দাম্মামে সপ্তম মেডিকেল সম্মেলনে বলেছেন, 'কুরআনে বর্ণিত মানুষের ক্রমোন্নতি সম্পর্কে তথ্যসমূহের ব্যাখ্যা প্রদানের সুযোগ পেয়ে আমি গভীরভাবে আনন্দিত। এটা আমার কাছে অত্যন্ত সুস্পষ্ট যে, মুহাম্মদ (স) এর নিকট এ সকল বর্ণনা অবশ্যই আল্লাহর নিকট হতেই এসেছিল। কারণ, এগুলোর প্রায় সকল জ্ঞানই পরবর্তী বহু শতাব্দী পরেও আবিষ্কৃত হয়নি। এটা থেকে আমি প্রমাণ পাই যে, 'মুহাম্মদ (স) অবশ্যই আল্লাহর রাসূল।' যুক্তরাষ্ট্রের হিউস্টনে বেলর কলেজ অব মেডিসিনের ধাত্রীবিদ্যা ও স্ত্রীরোগ বিভাগের চেয়ারম্যান ড. জো লিগ সিম্পসান ঘোষণা করেন, 'মুহাম্মদ (স) এর বর্ণিত এসব হাদিস সপ্তম শতাব্দীতে বিদ্যমান বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের ভিত্তিতে সংগৃহীত হয়নি। তাই পরবর্তীকালে দেখা গেল যে, ধর্মের সাথে জেনেটিক সায়েন্স বা প্রজননশাস্ত্রের কোনো পার্থক্য

নেই; তদুপরি প্রচলিত বৈজ্ঞানিক মতের সাথে ধর্ম তার বিস্ময়কর জ্ঞানকে যুক্ত করার মাধ্যমে বিজ্ঞানকে পথ প্রদর্শন করতে পারে– কুরআনে বর্ণিত বর্ণনাগুলো কয়েক শতাব্দী পরে সঠিক বলে প্রমাণিত হয়েছে; এতে প্রমাণিত হয় যে কুরআনের জ্ঞান আল্লাহ্ প্রদত্ত।'

তরল পদার্থের ফোঁটা থেকে মানুষ সৃষ্টি

পবিত্র কুরআনের সূরা তারিক্ব এর ৫ম থেকে ৭ম আয়াতে ইরশাদ হয়েছে–

فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّ خُلِقَ . خُلِقَ مِن مَّاءٍ دَافِقٍ . يَخْرُجُ مِن بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ .

অর্থ : সুতরাং মানুষের ভেবে দেখা উচিত কোন বস্তু হতে সে সৃজিত হয়েছে। তাকে সৃষ্টি করা হয়েছে সবেগে বের হয়ে আসা পানি থেকে। তা বের হয় মেরুদণ্ড ও বক্ষ পাঁজরের মাঝ থেকে।

জন্মপূর্ব অবস্থায় বিকাশের স্তরে পুরুষ ও স্ত্রীর জননেন্দ্রিয়গুলো যেমন— পুরুষের অণ্ডকোষ ও নারীর ডিম্বাশয়, কিডনীর কাছে মেরুদণ্ড স্তম্ভ এবং একাদশ ও দ্বাদশ বক্ষ পাঁজরের হাড়ের মাঝে বিকশিত হওয়া শুরু করে। সেগুলো ক্রমান্বয়ে নিচে নেমে আসে। স্ত্রীর ডিম্বাশয় মেরুদণ্ডের নিচে ও নিতম্বের মধ্যকার অস্থিকাঠামোর মধ্যে এসে জমে। কিন্তু জন্মের পূর্ব পর্যন্ত পুরুষের অণ্ডকোষ উরুর গোড়ার নালী দিয়ে অণ্ডকোষের থলিতে নেমে আসার ধারাবাহিকতা অব্যাহত থাকে। এমনকি বয়ঃপ্রাপ্ত অবস্থায় জননেন্দ্রিয় নিচে নেমে আসার পরেও মেরুদণ্ড ও বক্ষপাঁজরের মাঝে অবস্থিত উদরসংক্রান্ত বড় ধমনি থেকে এ অঙ্গগুলো উদ্দীপনা ও রক্ত সরবরাহ গ্রহণ করে। এমনকি রসজাতীয় পদার্থ পরিবাহী নালী এবং শিরাগুলো মিলিত হয় একই জায়গায়।

নুতফাহ্ ঃ সামান্য তরল পদার্থ

কুরআনে কমপক্ষে এগার বার উল্লেখ করা হয়েছে যে মানুষ নুতফাহ্ نُطْفَة থেকে সৃষ্ট। 'নুতফাহ' শব্দটির অর্থ হলো 'সামান্য পরিমাণ তরল' বা 'এক ফোঁটা তরল' যা পেয়ালাশূন্য করার পর পড়ে থাকে। এ বিষয়টি উল্লেখ করা হয়েছে কুরআনের নিম্নোক্ত সূরার আয়াতসমূহে–

১৬ ঃ ৪; ১৮ ঃ ৩৭, ২২ ঃ ৫, ২৩ ঃ ১৩; ৩৫ ঃ ১১; ৩৬ ঃ ৭৭; ৪০ ঃ ৬৭; ৫৩ ঃ ৪৬; ৭৬ ঃ ৩৭; ৭৬ ঃ ২ এবং ৮০ ঃ ১৯।

সাম্প্রতিককালে বিজ্ঞান দৃঢ়ভাবে সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছে যে, একটি ডিম্বাণুকে নিষিক্ত করার জন্য গড়ে ৩০ লক্ষ শুক্রাণু হতে মাত্র একটি শুক্রাণুর প্রয়োজন অর্থাৎ, নিষিক্তকরণের জন্য শুধু নির্গত শুক্রকীটের ১/৩ মিলিয়ন ভাগ অথবা ০.০০০০৩% শুক্রাণুর প্রয়োজন হয়।

সুলালাহ ঃ তরল পদার্থের নির্যাস

পবিত্র কুরআনের সূরা সাজদাহ-এর ৮ম আয়াতে বলা হয়েছে।

ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَهُ مِن سُلَالَةٍ مِّن مَّاءٍ مَّهِينٍ .

অর্থ ঃ অতঃপর তিনি তার বংশধর সৃষ্টি করেন তুচ্ছ পানির নির্যাস থেকে।

আরবি سُلَالَة (সুলালাহ্) শব্দের অর্থ হলো তরল পদার্থের নির্যাস কিংবা অবিভক্ত কোনো বস্তুর সর্বোত্তম অংশ। আমরা ইতোমধ্যেই জেনেছি পুরুষের দেহে তৈরি কয়েক মিলিয়ন শুক্রাণু থেকে ডিম্বাণুতে প্রবেশকারী একটি মাত্র শুক্রাণুই নিষেকক্রিয়া সম্পাদনের জন্য আবশ্যক। কয়েক মিলিয়নের মধ্য থেকে এই একটি মাত্র শুক্রাণুকীটকে কুরআন 'সুলালাহ' অর্থাৎ সর্বোত্তম অংশ বলে উল্লেখ করেছে। বর্তমানে আমরা এটাও জেনেছি যে স্ত্রী কর্তৃক উৎপাদিত হাজার হাজার ডিম্বাণুর মধ্য হতে মাত্র একটি ডিম্বাণু নিষিক্ত হয়ে থাকে। হাজার হাজার ডিম্বাণু থেকে কেবল একটি ডিম্বাণুকে 'সুলালাহ' নামে উল্লেখ করেছে কুরআন।

তরল পদার্থ থেকে সুষমভাবে আলাদা করে আনার অর্থেও সুলালাহ্ শব্দটি ব্যবহৃত হয়। এটি তরল পদার্থ দ্বারা জননকোষ ধারণকারী নারী ও পুরুষের ডিম্বাণুর তরল পদার্থকে বোঝায়। ডিম্বাণু ও শুক্রাণু উভয়কে নিষিক্তকরণের প্রক্রিয়ায় সুষমভাবে তাদের নিজস্ব পরিমণ্ডল থেকে বের করে আনা হয়।

আমশাজ ঃ মিশ্রিত তরল পদার্থ

পবিত্র কুরআনের সূরা আদ-দাহর এর ২য় আয়াতে বলা হয়েছে–

إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُّطْفَةٍ أَمْشَاجٍ .

অর্থ ঃ আমি মানুষকে সৃষ্টি করেছি মিশ্র শুক্রবিন্দু থেকে।

আরবি نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ (নুতফাতুন আমশাজ)-এর শাব্দিক অর্থ হচ্ছে, মিশ্রিত তরল পদার্থ। কতিপয় মুফাসসিরের মতে, মিশ্রিত তরল পদার্থ বলতে বোঝায় পুংলিঙ্গ ও স্ত্রীলিঙ্গ জাতীয় ধারক বা তরল পদার্থকে।

নারী ও পুরুষের ডিম্বাণু ও শুক্রাণু মিশ্রিত হওয়ার পরেও ভ্রূণ নুতফা আকারে অবস্থান করে। মিশ্রিত তরল পদার্থ বলতে এখানে শুক্রাণুজাতীয় তরল পদার্থকেও বোঝানো হতে পারে যা বিভিন্ন লালাগ্রন্থির নিঃসারিত রস থেকে তৈরি হয়। অতএব نُطْفَةٍ اَمْشَاجٍ (নুতফাতুন আমসাজ) এর অর্থ দাঁড়ায়, নারী ও পুরুষের ডিম্বাণু ও শুক্রাণু এবং এগুলোর চারপাশের তরল পদার্থের কিছু অংশ।

ভ্রূণের লিঙ্গ নির্ধারণ

ভ্রূণের লিঙ্গ নির্ধারিত হয় শুক্রাণুর প্রকৃতির দ্বারা, ডিম্বাণুর প্রকৃতির দ্বারা নয়। একটি শিশু কি নারী না পুরুষ হবে তা ২৩তম ক্রমোজোম-যথাক্রমে XX কিংবা XY এর ওপর নির্ভর করে।

প্রকৃতপক্ষে নিষিক্তকরণের সময় লিঙ্গ নির্ধারণ করার কাজটি হয়ে থাকে এবং এটা নির্ভর করে ডিম্বাণুকে শুক্রাণুর কোন প্রকার লিঙ্গ নির্ধারণী ক্রমোজোম নিষিক্ত করে তার ওপর। যদি এটা X বহনকারী শুক্রাণু হয় যা ডিম্বাণুকে নিষিক্ত করে, তাহলে ভ্রূণ হবে স্ত্রী এবং যদি এটা Y বহনকারী শুক্রাণু হয় তাহলে ভ্রূণ হবে পুরুষ।

পবিত্র কুরআনের সূরা আন-নাজম এর ৪৫ এবং ৪৬তম আয়াতে বলা হয়েছে–

وَاَنَّهٗ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْاُنْثٰى مِنْ نُّطْفَةٍ اِذَا تُمْنٰى ـ

অর্থ : তিনিই সৃষ্টি করেন যুগল পুরুষ ও নারী শুক্রবিন্দু থেকে যখন তা স্খলিত করা হয়।

আরবি শব্দ نُطْفَةٌ (নুতফা) অর্থ সামান্য তরল পদার্থ এবং تُمْنٰى (তুমনা) অর্থ স্খলিত বা নির্গত। নুতফা দ্বারা শুক্রাণুকেই বোঝানো হয়, যেহেতু শুক্রকীটই স্খলিত হয়।

কুরআনের সূরা ক্বিয়ামাহ এর ৩৭-৩৯ তম আয়াতে এ সম্পর্কে আরো উল্লেখ আছে–

اَلَمْ يَكُ نُطْفَةً مِّنْ مَّنِيٍّ يُّمْنٰى ـ ثُمَّ كَانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَوّٰى ـ فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْاُنْثٰى ـ

অর্থ : সে কি স্খলিত এক ফোঁটা শুক্রকীট ছিল না? অতঃপর সে পরিণত হয় এমন কিছুতে যা লেগে থাকে, এরপর আল্লাহ তাকে আকৃতি দান করলেন এবং যথার্থরূপে সুবিন্যস্ত করেন। তারপর তা থেকে সৃষ্টি করেছেন যুগল নর ও নারী।

এখানে نُطْفَةً مِّنْ مَّنِيٍّ (নুতফাতুন মিন মানিয়্যিন) শব্দ দ্বারা ভ্রূণের লিঙ্গ নির্ধারণের জন্য সাহায্যকারী হিসেবে পুরুষের নিকট থেকে আসা খুবই অল্প পরিমাণ শুক্রকীটকে বোঝানো হয়েছে।

উল্লেখ্য, ভারতীয় উপমহাদেশে শাশুড়িরা প্রায়ই নাতি কামনা করে এবং যদি নাতনী হয় তাহলে তারা পুত্রবধূকে দোষারোপ করে। তারা জানে না যে, নারীর ডিম্বাণু নয় বরং পুরুষের শুক্রকীটের প্রকৃতিই লিঙ্গ নির্ধারণের জন্য দায়ী। তাই কন্যা সন্তান প্রসবের জন্য পুত্রবধূদের দোষারোপ করা উচিত নয়। গর্ভের সন্তান ছেলে শিশু না হয়ে মেয়ে শিশু হওয়ার জন্য একমাত্র পিতাই দায়ী। নারীর ডিম্বাণুর ২৩ জোড়া ক্রোমোজমই নেগেটিভ কিন্তু পুরুষের ২৩ জোড়া ক্রোমোজোমের মধ্যে কিছু নেগেটিভ এবং কিছু পজেটিভ। এ কারণেই কুরআন ও বিজ্ঞান উভয়ই লিঙ্গ নির্ধারণের জন্য কেবল পুরুষের শুক্রকীটকেই কার্যকারক হিসেবে উল্লেখ করেছে।

ভ্রূণ তিনটি পর্দা দ্বারা সংরক্ষিত

পবিত্র কুরআনের সূরা যুমার এর ৬ষ্ঠ আয়াতে আল্লাহ ইরশাদ করেছেন–

يَخْلُقُكُمْ فِيْ بُطُوْنِ اُمَّهٰتِكُمْ خَلْقًا مِّنْ بَعْدِ خَلْقٍ فِيْ ظُلُمٰتٍ ثَلٰثٍ ـ

অর্থ ঃ তিনি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন তোমাদের মাতৃগর্ভে এক অবস্থার পর অন্য অবস্থায় তিন-তিনটি অন্ধকার পর্দার ভেতরে।

প্রফেসর ড. কেইথ মূরের মতানুসারে কুরআনের এ তিনটি স্তরের অন্ধকার বলতে বোঝায়–

১. মায়ের গর্ভের সম্মুখের প্রাচীর;

২. জরায়ুর প্রাচীর;

৩. শিশুকে ঢেকে রাখা ঝিল্লি।

ভ্রূণের বিভিন্ন পর্যায়

কুরআনে সূরা মুমিনূন-এর ১২-১৪ আয়াতে বলা হয়েছে–

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ مِنْ سُلٰلَةٍ مِّنْ طِيْنٍ ـ ثُمَّ جَعَلْنٰهُ نُطْفَةً فِيْ قَرَارٍ مَّكِيْنٍ ـ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظٰمًا فَكَسَوْنَا الْعِظٰمَ لَحْمًا ثُمَّ اَنْشَاْنٰهُ خَلْقًا اٰخَرَ فَتَبٰرَكَ اللّٰهُ اَحْسَنُ الْخٰلِقِيْنَ ـ

অর্থ : আমি মানুষকে তৈরি করেছি মাটির নির্যাস থেকে। অতঃপর আমি তাকে শুক্রবিন্দুরূপে এক সংরক্ষিত আধারে স্থাপন করেছি। এরপর আমি শুক্রবিন্দুকে জমাট রক্তরূপে সৃষ্টি করেছি। অতঃপর জমাট রক্তকে পরিণত করেছি মাংসপিণ্ডে, এরপর সেই মাংসপিণ্ড থেকে অস্থি সৃষ্টি করেছি, অতঃপর অস্থিকে মাংস দ্বারা আবৃত করেছি, অবশেষে তাকে নতুনরূপে দাঁড় করিয়েছি। নিপুণতম সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ কত কল্যাণময়।

উক্ত আয়াতে আল্লাহ বলেছেন, قَرَارٍ مَكِيْنٍ (ক্বারারিম মাকিন) বা দৃঢ়ভাবে অটল এক বিশ্রামের স্থানে সুরক্ষিত সামান্য তরল পদার্থ থেকে সৃষ্টি হয়েছে। পেছনের মাংসপেশী যে মেরুদণ্ডটিকে দৃঢ়ভাবে ধারণ করে আছে সেই মেরুদণ্ডের দ্বারা জরায়ুর পেছনের অংশ হতে উত্তমরূপে সংরক্ষিত। তাছাড়াও গর্ভফুলের রস ধারণকৃত গর্ভস্থলী দ্বারা ভ্রূণ সংরক্ষিত। সুতরাং ভ্রূণের রয়েছে একটি সুরক্ষিত নিরাপদ বাসস্থান।

এখানে عَلَقٌ (আলাক) এর অর্থ হলো, যা আটকে থাকে। এটার আরেক অর্থ হলো, 'জোঁক' সদৃশ বস্তু। উভয় বর্ণনাই বৈজ্ঞানিকভাবে গ্রহণীয়। কারণ প্রাথমিক অবস্থায় ভ্রূণ দেওয়ালের সাথে লেগে থাকে এবং এটাকে আকৃতিতে জোঁকের মতো দেখায়। এছাড়া এটি জোঁকের (রক্তচোষক) মতোই আচরণ করে। এটা গর্ভফুলের মধ্য দিয়ে রক্ত সরবরাহ করে থাকে।

عَلَقٌ (আলাক্ব) শব্দের আরেক অর্থ হচ্ছে 'রক্তপিণ্ড'। গর্ভধারণের তৃতীয় ও চতুর্থ সপ্তাহে রক্তপিণ্ডের স্তরে থাকা অবস্থায় রক্তপিণ্ডটি তরল পদার্থ পরিবেষ্টিত বন্ধ থলির মধ্যে অবস্থান করে। সুতরাং একই সময়ে রক্তের আকৃতির পাশাপাশি জোঁকের আকৃতিও ধারণ করে। এবার নির্দ্বিধায় গ্রহণযোগ্য কুরআনের জ্ঞানকে মানুষের বৈজ্ঞানিক তথ্য অর্জনের আপ্রাণ চেষ্টার সাথে তুলনা করে দেখুন।

সর্বপ্রথম ১৬৭৭ সালে বিজ্ঞানী অ্যান্থনী ভ্যান লিউয়েন হুক অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে মানুষের শুক্রকোষ পর্যবেক্ষণ করেন। তারা ভেবেছিলেন যে, অতি ক্ষুদ্রাকৃতির মানুষ জনন কোষে থাকে যা নবজাতকরূপে গড়ে ওঠার জন্য জরায়ুতে বিকাশ লাভ করে। এটি 'The Perforation Theory' বা 'ছিদ্রকরণ তত্ত্ব' নামে পরিচিত ছিল। যখন বিজ্ঞানীরা আবিষ্কার করলেন যে শুক্রাণুর চেয়ে ডিম্বাণু বড়, তখন ডিগ্রাফসহ অন্যান্য সমধর্মী বিজ্ঞানীরা চিন্তা করলেন ক্ষুদ্রাকৃতির ভ্রূণ বিকশিত হয় ডিম্বাণুর মধ্যে। পরবর্তী ১৮ শতাব্দীতে বিজ্ঞানী মাওপারটুইস 'মাতা-পিতার দ্বৈত উত্তরাধিকার তত্ত্ব'টি ব্যাপকভাবে প্রচার করেন।

عَلَقَة (আলাক্বা) রূপান্তরিত হয় مُضْغَة (মুদগাহ) তে, যার অর্থ হচ্ছে 'যা চর্বন করা হয় (দাঁত দিয়ে)' এবং এমন আঠালো এবং ছোট যা চুইংগামের মতো মুখে দেয়া যেতে পারে। এ উভয় ব্যাখ্যাই বৈজ্ঞানিকভাবে সঠিক প্রমাণিত হয়েছে। প্রফেসর ড. কেইথ মূর একটি প্লাস্টার সিল নিয়ে এটিকে ভ্রূণের প্রাথমিক স্তরের মতো তৈরি করে দাঁত দিয়ে চিবিয়ে মুদগায় পরিণত করতে চেষ্টা করেন। তিনি এ প্রক্রিয়াকে ভ্রূণের প্রাথমিক স্তরের চিত্রের সাথে তুলনা করেন। তিনি দেখেন চিবানো প্লাস্টার সিলে দাঁতের দাগ ভ্রূনের আকৃতির সাথে মিলে যায়, যা হলো মেরুদণ্ডের প্রাথমিক গঠন।

এ مُضْغَة (মুদগাহ) পরিণত হয় عِظَامٌ (ইযাম) বা হাড়ে। হাড়গুলোকে এক খণ্ড মাংসে বা মাংসপেশী لَحْم (লাহ্ম) পরানো হয়। এরপর আল্লাহ একে ভিন্ন সৃষ্টিতে তৈরি করেন।

প্রফেসর মার্শাল জনসন যুক্তরাষ্ট্রের অন্যতম নেতৃত্বস্থানীয় বিজ্ঞানী এবং যুক্তরাষ্ট্রের ফিলাডেলফিয়ার থমসন জেফারসন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন দানিয়েল ইনস্টিটিউটের সম্মানিত ডাইরেক্টর ও ব্যবচ্ছেদবিদ্যা (Anatomy) বিভাগের প্রধান। তার নিকট ভ্রূণ সংক্রান্ত কুরআনের আয়াতগুলো উপস্থাপন করে এগুলো সম্পর্কে তার মতামত চাইলে তিনি বলেন, 'ভ্রূণ তাত্ত্বিক পর্যায়গুলো সম্পর্কে কুরআনের আয়াতগুলো সমকালীন কোনো মত হতে পারে না।' তিনি আরও বলেন, 'সম্ভবত হযরত মুহাম্মদ (স) এর একটি শক্তিশালী অণুবীক্ষণ যন্ত্র ছিল।' যখন তাকে স্মরণ করিয়ে দেয়া হলো যে, কুরআন ১৪০০ বছর আগে অবতীর্ণ হয়েছে, আর অণুবীক্ষণ যন্ত্র আবিষ্কার হয়েছে নবী মুহাম্মদ (স) এর জীবনকালের বহু শতাব্দী পর, তখন তিনি হাসেন এবং স্বীকার করেন, প্রথম আবিষ্কৃত অণুবীক্ষণ যন্ত্র কোনো ক্ষুদ্র জিনিসকে ১০ গুণের বেশি বড় করে কিংবা পরিষ্কার ছবিও দেখাতে পারত না। তারপর তিনি বলেন, 'মুহাম্মদ (স) যখন কুরআন পাঠ করেন, তখন তাঁর ওপর ঐশী বাণী নাযিল হওয়ার বিষয়ে কোন বিরোধ দেখি না।'

প্রফেসর কেইথ মূরের মতে, বিশ্বজুড়ে গৃহীত আধুনিক কালের ভ্রূণের ক্রমোন্নতির স্তর সহজে বোধগম্য নয় কারণ, তাতে স্তরগুলোকে সংখ্যাগতভাবে চিহ্নিত করা হয়েছে। যেমন, প্রথম স্তর, দ্বিতীয় স্তর ইত্যাদি। পক্ষান্তরে যে স্তরগুলো ভ্রূণ অতিক্রম করে তার শ্রেণীবিভাগ কুরআনের বর্ণনানুসারে পার্থক্যসূচক এবং সহজেই

এগুলোর আকৃতি-প্রকৃতি চিহ্নিত করা সম্ভব। এগুলো জন্মপূর্ব বিভিন্ন স্তরের ওপর ভিত্তিশীল, বোধগম্য এবং বাস্তব, বৈজ্ঞানিক ও সাবলীল বর্ণনার ধারণাকারী।

পবিত্র কুরআনের সূরা কিয়ামাহ্‌র ৩৭ থেকে ৩৯তম আয়াতে মানব ভ্রূণ বিকাশের বিভিন্ন স্তর উল্লেখ করা হয়েছে। বলা হয়েছে–

اَلَمْ يَكُ نُطْفَةً مِّنْ مَّنِيٍّ يُّمْنٰى ـ ثُمَّ كَانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَوّٰى ـ فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْاُنْثٰى ـ

অর্থ : সে কি স্খলিত বীর্য ছিল না? এরপর সে ছিল রক্তপিণ্ড, তারপর আল্লাহ তাকে সৃষ্টি করেছেন এবং সুবিন্যস্ত করেছেন। অতঃপর তা থেকে সৃষ্টি করেছেন যুগল নর ও নারী।

অনুরূপভাবে সূরা ইনফিতার এর ৭ম ও ৮ম আয়াতে ঘোষণা করা হয়েছে–

اَلَّذِيْ خَلَقَكَ فَسَوّٰكَ فَعَدَلَكَ ـ فِيْ اَيِّ صُوْرَةٍ مَّا شَآءَ رَكَّبَكَ ـ

অর্থ : যিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছেন, অতঃপর তোমাকে সুবিন্যস্ত করেছেন এবং সুষম করেছেন। তিনি তোমাকে তাঁর ইচ্ছামত আকৃতিতে গঠন করেছেন।

ভ্রূণের গঠন প্রক্রিয়া

مُضْغَةً (মুদগা) অবস্থায় যদি ভ্রূণকে ছেদন এবং এর অভ্যন্তরীণ কোন অঙ্গকে কর্তন করা হয়, তাহলে দেখা যাবে এর অধিকাংশ সঠিকভাবে গঠিত, কিন্তু অন্যান্য অংশ পুরোপুরি গঠিত হয়নি। প্রফেসর জনসনের মতে, ভ্রূণকে যদি আমরা একটি পরিপূর্ণ সৃষ্টি হিসেবে বর্ণনা করি, তাহলে আমরা ঐ অংশটি বর্ণনা করছি– যা ইতোমধ্যেই সৃষ্টি হয়ে গেছে। আর যদি আমরা একে অপূর্ণ সৃষ্টি হিসেবে বর্ণনা করি, তাহলে ঐ অংশের বর্ণনা করছি— যে অংশ এখনও পর্যন্ত সৃষ্টি করা হয়নি। সুতরাং ভ্রূণ কি পূর্ণ সৃষ্টি না অপূর্ণ সৃষ্টি? এক্ষেত্রে কুরআনের বর্ণনা অপেক্ষা ভ্রূণের উৎপত্তির স্তর সম্পর্কে আর কোনো উত্তম বর্ণনা নেই। যেমন– কুরআনের সূরা হজ্জ এর ৫ম আয়াতে 'আংশিক গঠিত হয়েছে' এবং 'আংশিক গঠিত হয়নি' বলেও বর্ণনা করা হয়েছে। বলা হয়েছে—

فَاِنَّا خَلَقْنٰكُمْ مِّنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُّطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ مِنْ مُّضْغَةٍ مُّخَلَّقَةٍ وَّغَيْرِ مُخَلَّقَةٍ لِّنُبَيِّنَ لَكُمْ ـ

অর্থ : আমি তোমাদেরকে মাটি থেকে সৃষ্টি করেছি, এরপর বীর্য থেকে, এরপর জমাট রক্ত থেকে, এরপর পূর্ণাকৃতিবিশিষ্ট ও অপূর্ণাকৃতিবিশিষ্ট মাংসপিণ্ড থেকে, তোমাদের কাছে ব্যক্ত করার জন্য।

আমরা বৈজ্ঞানিক তথ্যাদি থেকে জানি যে, বিকাশের প্রাথমিক স্তরে কিছু পার্থক্যমূলক কোষ এবং কিছু সাদৃশ্যমূলক কোষ থাকে। অর্থাৎ কিছু অঙ্গ গঠিত এবং কিছু অঙ্গ এখনও অগঠিত।

শ্রবণ ও দৃষ্টিশক্তি সৃষ্টি

সর্বপ্রথম বিকাশমান মানব ভ্রূণের শ্রবণ ইন্দ্রিয়ের উদ্ভব ঘটে। ভ্রূণ শব্দ শুনতে পায় ২৮ তম সপ্তাহের পর হতে। পরবর্তীকালে দর্শন ইন্দ্রিয় বিকাশ লাভ করে এবং ২৮তম সপ্তাহ পরে রেটিনা বা অক্ষিপট আলোর প্রতি সংবেদনশীল হয়।

ভ্রূণে ইন্দ্রিয়ের বিকাশ সম্পর্কে কুরআনের সূরা সাজদার ৯ নম্বর আয়াতে বলা হয়—

وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْاَبْصَارَ وَالْاَفْئِدَةَ ـ

অর্থ ঃ আর তোমাদেরকে তিনি কান, চোখ ও অন্তর প্রদান করেন।

এই একই বিষয়ে সূরা মুমিনূনের ৭৮ তম আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে—

وَهُوَ الَّذِيْ اَنْشَاَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْاَبْصَارَ وَالْاَفْئِدَةَ قَلِيْلًا مَّا تَشْكُرُوْنَ ـ

অর্থ : আর তিনিই তোমাদের কান, চোখ ও অন্তঃকরণ সৃষ্টি করেছেন। তোমরা অতি অল্পই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে থাক।

সূরা আদদাহার-এর ২য় আয়াতে বলা হয়েছে–

اِنَّا خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ مِنْ نُّطْفَةٍ اَمْشَاجٍ نَّبْتَلِيْهِ فَجَعَلْنٰهُ سَمِيْعًا بَصِيْرًا ـ

অর্থ : নিশ্চয়ই আমি মানুষকে সৃষ্টি করেছি মিশ্র শুক্রবিন্দু থেকে তাকে পরীক্ষা করার জন্য। এজন্য তাকে করেছি শ্রবণশক্তি ও দৃষ্টিশক্তির অধিকারী।

আলোচ্য আয়াতগুলোতে দৃষ্টিশক্তির পূর্বে শ্রবণশক্তির কথা উল্লেখ করা হয়েছে। এভাবে আধুনিক ভ্রূণ বিজ্ঞানের আবিষ্কারের সাথে কুরআনের বর্ণনা সম্পূর্ণরূপে সাদৃশ্য ও সঙ্গতিপূর্ণ।

সাধারণ বিজ্ঞান

(General Science)

আঙ্গুলের ছাপ

পবিত্র কুরআনে সূরা কিয়ামাহ্‌র ৩-৪ আয়াতে বলা হয়—

أَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَلَّن نَّجْمَعَ عِظَامَهُ . بَلَىٰ قَادِرِينَ عَلَىٰ أَن نُّسَوِّيَ بَنَانَهُ .

অর্থ : মানুষ কি মনে করে যে আমি কখনো তার হাড়সমূহকে একত্র করব না? হ্যাঁ, আমি তার আঙ্গুলের অগ্রভাগ পর্যন্ত যথাযথভাবে সুবিন্যস্ত করতে সক্ষম।

অবিশ্বাসীরা প্রশ্ন করে মানুষ মরে গেলে হাড়গুলো মাটির মধ্যে বিভিন্ন অংশে বিক্ষিপ্ত ও বিচ্ছিন্ন হওয়ার পরও পুনরুত্থান এবং বিচারের দিনে সকল মানুষকে কীভাবে পৃথক পৃথক চিহ্নিত করা হবে? সর্বশক্তিমান আল্লাহ্ সংশয়বাদীদের এরূপ প্রশ্নের জবাবে সাফ জানিয়ে দিয়েছেন; তিনি কেবল হাড়গুলোকে জমা করাই নয় বরং আঙ্গুলের ছাপও যথাযথভাবে পুনরায় তৈরি করতে সক্ষম।

কুরআন কেন ব্যক্তি পরিচয় নির্ধারণের ব্যাপারে আঙ্গুলের ছাপ সম্পর্কে কথা বলেছে?

১৮৮০ সালে স্যার ফ্র্যান্সিস গোল্ট-এর গবেষণার ফলাফলের ওপর ভিত্তি করে পরিচয় নির্ধারণে আঙ্গুলের ছাপ বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি হিসেবে গ্রহণ করা হয়। সারা দুনিয়ায় এমন দুজন ব্যক্তিও নেই যাদের আঙ্গুলের ছাপ সম্পূর্ণ একই রকম। এ কারণে বিশ্বব্যাপী পুলিশ বাহিনী অপরাধীদের শনাক্ত করতে আঙ্গুলের ছাপ পরীক্ষা করে থাকে। ১৪০০ বছর পূর্বে প্রত্যেক ব্যক্তির আঙ্গুলের ছাপের স্বাতন্ত্র্য সম্পর্কে মহান আল্লাহ্ জানিয়ে দিয়েছেন।

ত্বকে ব্যথা অনুভবকারী গ্রন্থি

এই কিছুদিন আগেও মনে করা হতো যে, অনুভূতি ও ব্যথার উপলব্ধি মস্তিষ্কের ওপর নির্ভরশীল। সাম্প্রতিক আবিষ্কার প্রমাণ করেছে ত্বকে ব্যথা উপলব্ধিকারী উপকরণ বিদ্যমান। ঐ উপাদান ছাড়া ব্যক্তি ব্যথা অনুভব করতে পারে না। আগুনে পুড়ে ক্ষত সৃষ্টি হলে ডাক্তার যখন তার চিকিৎসা করেন তখন একটি সুঁচালো পিন দ্বারা পোড়ার মাত্রা পরীক্ষা করেন। রোগী ব্যথা অনুভব করলে ডাক্তার খুশী হন। কারণ এর দ্বারা উপলব্ধি করা যায় যে পোড়ার ক্ষতটি অগভীর এবং ব্যথা

উপলব্ধিকারী উপকরণ অক্ষত রয়েছে। বিপরীতক্রমে রোগী ব্যথা অনুভব না করলে বোঝা যায় যে, পোড়ার ক্ষতটি গভীর এবং ব্যথা উপলব্ধিকারী কোষসমূহ বিনষ্ট হয়ে গেছে।

পবিত্র কুরআনের সূরা নিসা-এর ৫৬ আয়াতে ব্যথা উপলব্ধিকারী গ্রন্থি বা কোষের অস্তিত্বেরই ইঙ্গিত প্রদান করে বলা হয়েছে—

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا سَوْفَ نُصْلِيهِمْ نَارًا كُلَّمَا نَضِجَتْ جُلُودُهُم بَدَّلْنَاهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا لِيَذُوقُوا الْعَذَابَ . إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَزِيزًا حَكِيمًا .

অর্থ : যারা আমার আয়াতকে অস্বীকার করে নিশ্চয়ই আমি তাদেরকে আগুনে নিক্ষেপ করব। আর যখনই তাদের গায়ের চামড়া পুড়ে যাবে তখন আমি পাল্টে দেব নতুন চামড়া দিয়ে, যাতে তারা (শাস্তির পর) শাস্তি ভোগ করে, নিশ্চয়ই আল্লাহ্ পরাক্রমশালী ও প্রজ্ঞাময়।

ব্যথা উপলব্ধিকারী উপকরণ তথা গ্রন্থি বা কোষের ওপর দীর্ঘকাল গবেষণা করেছেন। থাইল্যান্ডের চিয়াং মাই বিশ্ববিদ্যালয়ের এনাটমি বিভাগের চেয়ারম্যান প্রফেসর তাগাতাত তেজাসেন প্রথম দিকে তিনি বিশ্বাস করতেন না, এ বৈজ্ঞানিক সত্যটি কুরআন ১৪০০ বছর আগেই উল্লেখ করেছে। পরবর্তীকালে তিনি কুরআনের এ বিশেষ আয়াতটির অনুবাদ পরীক্ষা করেন। প্রফেসর তেজাসেন কুরআনের এ আয়াতটির বৈজ্ঞানিক নির্ভুলতায় এতটা অভিভূত হয়ে পড়েন যে, রিয়াদে অনুষ্ঠিত 'কুরআন ও সুন্নাহ্‌র বৈজ্ঞানিক দিকদর্শনাবলি' বিষয়ের ওপর ৮ম সৌদি মেডিকেল কনফারেন্সে প্রকাশ্যে ঘোষণা করেন—

لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ .

অর্থ : আল্লাহ্ ছাড়া কোনো মাবুদ নেই এবং মুহাম্মদ (স) আল্লাহ্‌র রাসূল।

আল-কুরআন ও বৈজ্ঞানিক সত্য

কুরআনে বর্ণিত বৈজ্ঞানিক সত্যগুলোর উপস্থিতিকে সাম্প্রতিক সংঘটিত কোনো ঘটনা হিসেবে অভিহিত করা সাধারণ জ্ঞান ও সত্যিকার বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গির পরিপন্থী। প্রকৃতপক্ষে কুরআনের আয়াতসমূহের বৈজ্ঞানিক নির্ভুলতাই কুরআনের উন্মুক্ত ঘোষণার নিশ্চয়তা প্রদান করে। সূরা আলে ইমরান এর ১৯০তম আয়াতে ঘোষণা করা হয়েছে—

إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِّأُولِي الْأَلْبَابِ .

অর্থ : নিশ্চয়ই আসমান ও জমিনের সৃষ্টিতে এবং দিন ও রাতের আবর্তনের মধ্যে জ্ঞানীদের জন্য রয়েছে সুস্পষ্ট নিদর্শন।

কুরআনের বৈজ্ঞানিক সাক্ষ্য স্পষ্টত প্রমাণ করে, এটি আল্লাহর বাণী। যেসব সত্য মানুষের দ্বারা আবিষ্কৃত হবে শত শত বছর পর, সুদীর্ঘ ১৪০০ বছর পূর্বে কোন মানুষের দ্বারা এমন সত্য ও বস্তুনিষ্ঠ বৈজ্ঞানিক বিষয়াদি সম্বলিত কোনো বই লেখা সম্ভব ছিল না।

কুরআন বিজ্ঞানের কোনো গ্রন্থ নয় বরং নিদর্শন গ্রন্থ। এ নিদর্শনাবলি মানুষকে আহ্বান জানায় পৃথিবীতে তার অবস্থানের উদ্দেশ্য উপলব্ধি করতে। কুরআন যথার্থভাবেই সারা বিশ্বের সৃষ্টিকর্তা ও রক্ষক আল্লাহর বাণী। এতে আল্লাহর একত্ববাদের পয়গাম রয়েছে যার প্রতি সকল নবী-রাসূলগণ দাওয়াত দিয়েছেন। তাদের মধ্যে আদম (আ), মূসা (আ), ঈসা (আ) এবং মুহাম্মদ (স) অন্যতম।

বহু বৃহৎ গ্রন্থ 'কুরআন ও আধুনিক বিজ্ঞান' বিষয়ের ওপর লেখা হয়েছে এবং এ নিয়ে আরও অনেক গবেষণা চলছে। ইনশাআল্লাহ এ গবেষণা মানবজাতিকে সর্বশক্তিমান আল্লাহর আরও নিকটবর্তী হওয়ার সুযোগ তৈরি করবে। এখানে কুরআনের অল্প কয়েকটি বৈজ্ঞানিক সত্য উপস্থাপন করা হয়েছে। আমি বিষয়টির ওপর পূর্ণ ইনসাফ করতে পেরেছি বলে দাবি করছি না।

প্রফেসর তেজাসেন কুরআনে উল্লিখিত একটি মাত্র বৈজ্ঞানিক নিদর্শনের শক্তির কারণে ইসলাম গ্রহণ করেছেন। কুরআন যে আসমানী কিতাব তা নিশ্চিত হতে প্রমাণস্বরূপ কারো প্রয়োজন হতে পারে ১০টি নিদর্শন। কেউ হয়তো ১০০টি নিদর্শনের প্রয়োজন অনুভব করতে পারে। আবার কেউ ১০০০টি নিদর্শন দেখেও সত্য (ইসলাম) গ্রহণ করবে না। এ ধরনের অন্ধ মানসিকতার নিন্দা করে কুরআনের সূরা বাকারা- এর ১৮তম আয়াতে ঘোষণা করা হয়েছে–

صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَرْجِعُوْنَ.

অর্থ ঃ এরা বধির, বোবা ও অন্ধ। সুতরাং এরা (সঠিক পথে) ফিরে আসবে না।

ব্যক্তি ও সমাজের জন্য কুরআন একটি পরিপূর্ণ জীবনব্যবস্থা। আলহামদুলিল্লাহ, এ জীবনব্যবস্থা বিভিন্ন মতবাদের চেয়ে অধিকতর উত্তম। তাছাড়া স্রষ্টার চেয়ে ভালো পথনির্দেশ আর কে প্রদান করতে পারে?

তাই আমি একান্ত হৃদয়ে দোয়া করি, আল্লাহ যেন এ সামান্য প্রচেষ্টাটুকু কবুল করেন। অবশেষে আমি তাঁর ক্ষমা ও হিদায়াত কামনা করছি।